অনীক

মে ২০১৩

বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ১১

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

তৃণমূল সরকারের দু'বছর ❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ২

অটোমোবাইল শিল্প

অটোমোবাইল শিল্পে শ্রমিক... ❑ সুমিতা ❑ ৪

মারুতির শ্রমিক আন্দোলন ❑ অরিজিৎ ❑ ৫

জেলের চিঠি ❑ মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ❑ ৭

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে গারমেন্ট শিল্প... ❑ মিতা দত্ত ❑ ৯

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ❑ ধূর্জটিপ্রসাদ বক্সী ❑ ১৩

শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যা ❑ কুশল দেবনাথ ❑ ১৭

আন্তর্জাতিক সংহতি লক্ষ্য... ❑ আশিসকুসুম ঘোষ ❑ ২২

ধর্ষণ, ভার্মা কমিশন ও... ❑ রূপা আইচ ❑ ২৪

জলপাই-ডুয়ার্সের বনবাসীরা ❑ সুমন গোস্বামী ❑ ৩০

কোদানকুলম নিয়ে... ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৩৪

কবিতা

এখন তোমার পা ❑ আলী রীয়াজ ❑ ১২

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

দীপংকর চক্রবর্তী ও মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ❑ মিলন মালাকার ❑ ৩৮

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com

ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**

সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

মুমূর্ষু গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের নাকি চারটি স্তম্ভ— আইনসভা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা এবং সংবাদমাধ্যম। এই চারটি স্তম্ভ যদি স্বচ্ছ, শক্তিশালী এবং সক্রিয় হয়, গণতন্ত্রের বুনিয়াদ নাকি বেশ পোক্ত হয়। তবে এমন কোন গণতন্ত্র এখনও পর্যন্ত আমরা দেখিনি, যেখানে পুলিশ-মিলিটারি নেই। এই পঞ্চম স্তম্ভটি দুর্বল হলে গণতন্ত্রের রক্ষীরা আতঙ্কে দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেন!

ভারতের আমজনতা অতশত বোঝেনা। তারা জানে, দেবতার প্রসাদ পেতে হলে নৈবেদ্য দিতে হয়। তারা জানে, 'গণতন্ত্র' দেবতাকেও প্রণামী না দিলে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ হবেনা। আমাদের দেশে দারিদ্র সীমার নীচে যাদের বাস, খেতে না পেলেও হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে শুরু করে জমির পাট্টা, রেশন কার্ড বা ব্যাঙ্ক ঋণ— জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে গণতন্ত্রের বেদীমূলে পূজা দিয়ে তাদের বাঁচতে হয়। এর মাত্রা রীতিমতো চমকে দেয়। বছরে ৮৮৩ কোটি টাকা। শুধুমাত্র পঞ্চম স্তম্ভে নৈবেদ্য নিবেদন করতে হয়েছে ২১৫ কোটি টাকা।

যাই হোক, আমাদের ১২০ কোটির দেশ। তাদের মধ্যে ৩৫ কোটি কীভাবে বেঁচে থাকে, তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এটা ঠিক যে, আমাদের রাজনীতিবিদ-মন্ত্রীরাও ধোয়া তুলসীপাতা নয় এবং তাদের কল্যাণে সংসদ, যেটা কিনা গণতন্ত্রের আইকন, সেই স্তম্ভও কালিমালিপ্ত হয়েছে। তবুও প্রায়ই মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে আমাদের এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আছে— হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, সিবিআই। এরা হচ্ছে উচ্চকোটির দেবতা। শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে আমজনতারও এই দেবতাদের সম্বন্ধে ভয় মিশ্রিত এক সম্ভ্রমবোধ আছে। কিন্তু, সম্প্রতি যা দেখা যাচ্ছে, এইসব উচ্চকোটি দেবতাদেরও পতন হচ্ছে। সেখানেও টাকার খেলাও চলছে।

সিবিআই হলো দেবতাদের নজরদারি সংস্থা। বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলে, 'ক্যাবিনেট ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন'। কোথায় কখন কতটা নজর দিতে হবে, সে ব্যাপারে নাকি অদৃশ্য এক নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। বিষয়টা এখন আর 'ওপন সিক্রেট' নয়, সিবিআই অধিকর্তা স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টে জবানবন্দীতে পুরোপুরি 'ওপন' করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক ঘটনাটিতে এতই অস্বাভাবিকতা ছিল যে বিষয়টি আর গোপন করে রাখা যায় নি। ক্যাগ-রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিগত বছরগুলিতে সরকারের কয়লা মন্ত্রক বেআইনি পদ্ধতিতে বিভিন্ন কোম্পানিকে কয়লাখনি বিতরণ করার মাধ্যমে কোম্পানিগুলিকে বিপুল মুনাফা লুঠ করতে সাহায্য করেছে। মুনাফার অঙ্ক আমজনতার বোধগম্যতার বাইরে, ১০.৬৭ লক্ষ কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-কে তদন্ত করতে বলে। সিবিআই স্বীকার করেছে, সরকারের মন্ত্রী ও আমলাদের খসড়া রিপোর্ট দেখিয়ে, তাঁদের পরামর্শমতো রিপোর্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও এই ব্যাপারে জড়িত। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-কে "খাঁচার তোতাপাখি" আখ্যা দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, সমস্ত তদন্তটাই একটা প্রহসন। মন্ত্রীর পদত্যাগেই হয়তো বিষয়টা চাপা পড়ে যাবে। গলিত গণতন্ত্র বেঁচে থাকবে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত ছিল, তারা সেই অবস্থান হারিয়েছে। গত সাড়ে ছয় দশক ধরে যে ব্যবস্থার উপর মানুষকে আস্থা রাখতে শেখানো হয়েছে, সে ব্যবস্থার উপর মানুষ আর ভরসা রাখতে পারছে না। ভোটযুদ্ধে একপক্ষ হয়তো ক্ষমতাচ্যুত হয়। কিন্তু যে আসে সেও তো লুঠ করতেই আসে। এই যেমন অতি-সম্প্রতি কর্ণাটকে খনি কেলেংকারির নায়ক বিজেপি সরকারের বদলে ২-জি, কমনওয়েলথ গেমস, কোলগেট, কৃষিঋণ ইত্যাদি কেলেঙ্কারির পালক-শোভিত কংগ্রেস স্থলাভিষিক্ত হলো। তাতে অবস্থার কি আদৌ পরিবর্তন হবে?

অবস্থার পরিবর্তন করা শাসকশ্রেণীর আয়ত্তের বাইরে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে যদি পরিবর্তন আনতে হয় তো, সে আনতে পারে একমাত্র দেশব্যাপী নিপীড়িত মানুষের গণআন্দোলন। প্রতিবাদ-প্রতিরোধই গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি। সে প্রতিবাদ বর্তমান ব্যবস্থাকে মানার জন্য নয়, বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পাল্টানোর জন্য।

ঘটনাপ্রবাহ

তৃণমূল সরকারের দু'বছর

পরিচয় কানুনগো

দু'বছর হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গে নতুন এক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা সাধারণের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, এই দু'বছরের মধ্যেই তা প্রায় স্তিমিত। সিঙ্গুরের কৃষকদের সমস্ত উচ্ছ্বাস অপহৃত, নন্দীগ্রামের মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা নির্বাপিত, জঙ্গলমহলের মানুষ এখনও সন্ত্রস্ত, পাহাড় সংশয়াচ্ছন্ন আর খাস কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা হতাশাগ্রস্ত। মাত্র দু'বছরে এই পরিবর্তন সত্যই বিস্ময় জাগায়। আবার বিষয়টা এমনও নয় যে, শাসকদলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে বা মানুষ বামফ্রন্টের উপর নতুন করে আস্থা রাখতে শুরু করেছে। কয়েকমাস আগে (ফেব্রুয়ারি ২০১৩) পশ্চিমবঙ্গে তিনটি উপনির্বাচন হয়ে গেল। মাত্র একটিতে শাসক তৃণমূল দলের প্রার্থী নির্বাচিত হতে পেরেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, তিনটি কেন্দ্রেই বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট, ২০১১ সালের তুলনাতেও, উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। তবুও শাসক দলের পরাজয় এটাই ইঙ্গিত করে যে বামফ্রন্টের একমাত্র বিকল্প হিসাবে তৃণমূল অন্তত এই উপনির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় ইতিহাসে, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেও পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের ক্ষমতলাভ। দুটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাযুজ্য আছে। ইন্দিরা-জমানায় ক্ষমতার বলদর্পী প্রকাশ, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ, চূড়ান্ত দলতন্ত্র, সর্বোপরি জরুরি অবস্থার মাধ্যমে কণ্ঠরোধ এবং সিদ্ধার্থ রায়ের প্রশাসনে বধ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গে কার্যত দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ১৯৭৭ সালে প্রায় তিন দশকের কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ২০১১ সালে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-নেতাই-উত্তর, পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনীর দাপট-সন্ত্রস্ত, পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসনিক শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি একই কারণে মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে রেহাই পেতে চেয়েছিল। বামফ্রন্ট যেমন নির্বাচনী লড়াইয়ে মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবীদের এক বড়ো অংশের সমর্থন পেয়েছিল— নন্দীগ্রামে বামফ্রন্টের পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৪ জন পুরুষ-নারীকে হত্যা করার পর মমতা ব্যানার্জিকেও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেতে অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ৪৭ শতাংশ (সিপিআই-সহ) ভোটদাতাদের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। ২০১১ সালে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট ৪৮ শতাংশ ভোটদাতাদের সমর্থন আদায় করেছে। এ রাজ্যে অনেক দক্ষিণভিমুখী উদারপন্থী মানুষ ইন্দিরা-সিদ্ধার্থের স্বৈরাচারের বিরোধিতায় মুখ খুলেছিলেন। স্বাধীন চিন্তাবিদ বামপন্থীদের অনেকেই সিপিআই(এম)-এর স্বৈরাচার বরদাস্ত করতে পারেন নি।

ক্ষমতার্জনের পর বামফ্রন্ট প্রথমেই এমন এক পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা তদানীন্তন প্রশাসনে সত্যই অকল্পনীয় ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত পুলিশ কেস প্রত্যাহারের পিছনে সিপিআই(এম)-এর দলগত স্বার্থচিন্তা থেকে থাকতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে এই রাষ্ট্রীয়-মার্জনা প্রদর্শন বামফ্রন্টের গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, 'মরিচঝাঁপি'র মতো অনেক অপরাধের বিরুদ্ধেও সেরকম প্রতিরোধ-প্রতিবাদ গড়ে উঠতে পারেনি। এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যর্থ। সিঙ্গুর আন্দোলনের পর্যায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'বামপন্থী' ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন, যার জোরে বেশ কিছু বামপন্থীদের তিনি নিজের চারপাশে সমবেত করতেও পেরেছিলেন, সেই 'বামপন্থী' ভাবমূর্তি খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে প্রধানত দুটি কারণে— রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব এবং তৃণমূল প্রশাসনে জঙ্গলমহলে যৌথ বাহিনীর ধারাবাহিক অবস্থান ও অত্যাচার। প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে যে কোন দলই রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গুরুত্ব হারায়। শাসকদলেরই কত কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার পাহাড় জমা হয়ে রয়েছে, সেগুলোরও কোন মীমাংসা হচ্ছেনা। তার উপর সামান্য বিরোধিতা দেখলেই যখন-তখন 'মাওবাদী' তকমা লাগিয়ে ইউপিএ ধারার প্রয়োগ অব্যাহত।

একথা তো ভুললে চলবে না যে তৃণমূল দলের জন্ম কংগ্রেসের জঠরে। রাষ্ট্রক্ষমতার যারা অংশীদার, সেই ধরনের দলের গণতান্ত্রিক অধিকার বা মানবাধিকারের চেতনা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের গণ্ডীর দ্বারা সীমাবদ্ধ। বামফ্রন্ট সরকারও রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকে অস্বীকার করেনি। পুলিশের লাঠি, গুলি, জেল হেফাজতে মৃত্যু— এমন তো কতই হয়েছে। 'মাধাই হালদার'রা 'নিরামিষ' আন্দোলনকে 'আমিষ' করেছে বলে তাদের মরতে হয়েছে। তবে এই পর্যায়ে যেতে বামফ্রন্ট কিছুটা সময় নিয়েছিল। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতাকে সংহত ক'রে, জমি বিলি ও বর্গাদার রেকর্ডের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের মধ্যে দলীয় প্রভাব বিস্তার করাটাই ছিল প্রথম বামফ্রন্টের লক্ষ্য। ঠিক এই ধরনের কর্মসূচি মমতা ব্যানার্জির খাতায় অনুপস্থিত। তাঁর দুটি ঘোষণাকে মানুষ অবশ্য স্বাগত জানিয়েছিল। সে দুটি হলো,

'কর্পোরেট সংস্থার জন্য জমি অধিগ্রহণে অসম্মতি' এবং 'খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বিরোধিতা'। বিরোধিতা করলেন, কিন্তু কোন সদর্থক কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারলেন না।

তৃণমূল দলের ৬৪ পাতার বাংলা নির্বাচনী ইস্তাহারের ২২ পাতা রেল-কেন্দ্রিক কর্মসূচির বর্ণনা। রেল তো এখন তৃণমূল দলের হাতছাড়া। সুতরাং সেই ২২ পাতা তো বরবাদ। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরের কর্মসূচিকে রাজ্য সরকারের কর্মসূচি হিসাবে দেখানো যেতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তৃণমূলের ইস্তাহার নিদর্শন হয়ে থাকবে। যাই হোক, নয়া মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে সিঙ্গুরের অধিগৃহীত জমি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত। সিঙ্গুরের জমিহারা কৃষকরা আনন্দোৎসব শুরু করে দিল। কিন্তু সেই উৎসব শোকে পরিণত হতে বেশি সময় নেয়নি। আর এর জন্যে দায়ী একমাত্র তৃণমূল দলের অদূরদর্শী নীতি। বিপথে চালিত হওয়ার জন্য সরকার ও দলের অভ্যন্তরে কায়েমী স্বার্থের প্রভাবের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেনা। *অনীক* এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। সুতরাং বিশদ আলোচনা আপাতত থাক।

ক্ষমতায় আসীন হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের প্রাক্তন সচিব দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ বসু-র সমন্বয়ে, ভূমিনীতির দিক নির্দেশ করার জন্য একটি কমিটি গড়লেন। কমিটিকে বেশি সময়ও দেওয়া হয়নি। কমিটির রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করাও হয়েছে। আজ পর্যন্ত সরকার সেই রিপোর্ট সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি। রিপোর্টটিও প্রকাশ করা হয়নি। কার্যত ভূমিনীতির ক্ষেত্রে তৃণমূল ও শেষ পর্যায়ের বামফ্রন্টের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যাচ্ছেনা। কর্পোরেট সংস্থার অনুকূলে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার আইনে যে বিতর্কিত সংশোধনগুলি করেছিল, তার কোনটাই তৃণমূল সরকার প্রত্যাহার করেনি। বরং জমি সম্বন্ধে বিশ্বব্যাঙ্কের যে সুপারিশ ছিল, সে সব শর্ত মেনেই ভূমি সংস্কার আইনে সাম্প্রতিক সংশোধনগুলি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, তা কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থেই। বামফ্রন্টের 'চাষ ও বসবাসের জমি বন্দোবস্ত' প্রকল্পের অনুকরণে 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্প ছাড়া ভূমি সংস্কারের আর কোন বিষয়েই সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। দেনার দায়ে গরিব কৃষক আত্মহত্যা করলে সহানুভূতি দূরের কথা, মুখ্যমন্ত্রী স্রেফ অস্বীকার করে গেলেন। নোনাডাঙায় গরিব মানুষদের উচ্ছেদের চেষ্টা করতেও তাঁর হাত কাঁপেনি।

শিল্প নিয়ে এই সরকারের 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। মিডিয়া ও শিল্পপতিদের চাপ মেনে সরকার জমি অধিগ্রহণে সায় দিতে পারছে না, আবার তাদের তোয়াজও কিছু কম করা হচ্ছেনা। নির্বাচনী ইস্তাহারে *সেজ* করা হবে না ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে *সেজ*-এর জন্য ইনফোসিসের বায়না মেটাতে *সেজ*-এর সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে বলে শিল্পমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে চলেছেন। এই দ্বিমুখী শিল্পনীতি বর্তমান সরকারের বৈশিষ্ট্য। কিছুদিন আগে, সাংসদ শ্রী সৌগত রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের পর তাঁকে রাজ্যের শিল্প উপদেষ্টার পদে নিয়োগ করা হয়। উপদেষ্টা হিসাবে তিনি যথারীতি তাঁর সুপারিশও পেশ করেন। কিন্তু দেখা গেল, রিপোর্ট পেশের পরেই শ্রী রায় পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। সংবাদে প্রকাশ, তাঁর সুপারিশ তৃণমূলের একাংশের এবং মুখ্যমন্ত্রীর নাকি পছন্দ হয়নি। যথারীতি এই রিপোর্টও লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গেছে। সর্বত্রই সরকারের এক দোদুল্যমান অবস্থা।

বামফ্রন্টের আমল থেকেই প্রোমোটারি, চিটফান্ড ইত্যাদি ব্যবসার মাধ্যমে লুম্পেন পুঁজিপতিরা এই রাজ্যে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে শুরু করেছে। সরকার বদলের সাথে সাথে তারা খুঁটি বদল করেছে। সম্প্রতি 'সারদা' কাণ্ডে, গার্ডেনরিচ ঘটনায়, এই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে শাসক দলের যে ঘনিষ্ঠতা মানুষের নজরে এসেছে, তাতে বোঝা যায়, বাস্তুঘুঘুরা সরকারের অভ্যন্তরে বাসা বেঁধেছে। এই বাস্তুঘুঘুদের চাপেই তপন দত্ত, নাজিমুদ্দিনের মতো দলীয় কর্মীরা খুন হয়ে গেলেও অপরাধীদের ধরতে সরকারের হেলদোল দেখা যায়না।

এই অস্থিরতা নিয়েই সরকার চলছে। কল্পনা থাকতে পারে, কিন্তু পরিকল্পনার অভাব আছে। এই অস্থিরতা থেকেই জন্ম নিয়েছে সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব। এই অস্থিরতার জন্যই নেত্রী সর্বত্র মাওবাদের ভূত দেখছেন, সমালোচনায় উত্তেজিত হচ্ছেন। শিলাদিত্যের নিরীহ প্রশ্নেও তিনি ক্রুদ্ধ হন। কোন্ ঘটনায় নারীত্বের অবমাননা ঘটে, ছাত্রদের কোন্ আচরণ ছেলেমানুষি আর কোনটা গুন্ডামি, একই অপরাধের জন্য কাকে কখন গ্রেপ্তার করা হবে আর কাকে হবেনা— এ সবকিছুই ঠিক হচ্ছে দলীয় রাজনীতির মাপকাঠিতে। নজিরবিহীন ভাবে নির্বাচনে পরাজিত এক ব্যক্তি মন্ত্রীত্বের গদি আঁকড়ে বসে আছেন, শুধুমাত্র দলীয় আনুগত্যের জোরে। নাগরিক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অর্জিত অধিকার পদদলিত। অনুগত আমলা এবং মস্তান ছাড়া কারোর কোন স্বাধীনতা নেই।

বাধাহীন বাজার বিস্তারের জন্য পুঁজি মূলত দুটি জিনিস খোঁজে-- সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ। এই দু'বছরে পুঁজির দ্বিতীয় চাহিদাটি পূরণে তৃণমূল সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে। পুঁজিবাদীরা আশান্বিত, বাকি চাহিদাটুকুও পূরিত হবে। তবে মানুষ কি এত সহজে ছেড়ে দেবে?

অটোমোবাইল শিল্পে শ্রমিক বিক্ষোভ

সুমিতা

কয়েক বছর ধরে অটোমোবাইল শিল্পে শ্রমিক অশান্তি প্রায়ই খবর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গুরগাঁও-মানেসর এলাকাগুলি প্রায়শ খবরে আসছে শ্রমিক বিক্ষোভ, স্ট্রাইক, পুলিশি সন্ত্রাস ইত্যাদি কারণে। এর পেছনে কারণ কী? কী অবস্থা ঐ শিল্পের? কারখানাগুলোর, উৎপাদনের, মুনাফার, আর শ্রমিকদের? বর্তমান লেখাটিতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা করা হবে।

দিল্লীর কাছে গুরগাঁও-মানেসর-বাওয়াল অঞ্চল বেশ কিছুদিন ধরেই অটোমোবাইল শিল্পের হাব। মারুতি সুজুকি থেকে বাজাজ-হন্ডা— অনেকগুলি বড় বড় কারখানা সেখানে গড়ে উঠেছে। দেশের মোট গাড়ি উৎপাদনের ৬০ শতাংশই হয় এই অঞ্চলে। আবার অটোমোবাইল শিল্পের অনেক কারখানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সারা দেশে।

সব জায়গায়ই শ্রমিক বিক্ষুব্ধ। উদাহরণ অজস্র। ২০০৯ ও ২০১১ সালে নাসিকের মহীন্দ্রার কারখানা; ২০০৯ সালে গুরগাঁওয়ের সানমি অটো, পুনের বস চ্যাসিস, মানেসরের হোন্ডা মোটরসাইকেল, গুরগাঁওয়ের রিকো অটো, কোয়াম্বাটরে প্রিকল; ২০১০ সালে কর্নাটকে ভলভো, চেন্নাইয়ের এমআরএফ টায়ার্স; ২০১১ সালে গুজরাটে জেনারেল মোটর্স, চেন্নাইয়ের এমআরএফ টায়ার্স, ব্যাঙ্গালোরে বস, হুগলিতে ডানলপ, শ্রীপেরুমবুদুরে কাপারো; ২০১২ সালে তামিলনাড়ুর ডানলপ কারখানা, চেন্নাইয়ের হুন্ডাই কারখানা শ্রমিক বিক্ষোভের জন্য সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছে। মারুতি সুজুকি তো আছেই।

বিক্ষোভ অবশ্য শুধুমাত্র অটোমোবাইল শিল্পে নয়, কিন্তু তা কেন্দ্রীভূত সেখানেই।

গত কয়েক বছরে অটোমোবাইল শিল্প দ্রুত বেড়েছে। ২০০৪-০৫ সালে যেখানে উৎপাদন হয়েছিল মোট ৮৫ লক্ষ গাড়ি, ২০১১-১২ সালে উৎপাদন হয়েছে মোট ২.০৪ কোটি গাড়ি। গত দশকে দেশে যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, অটোমোবাইল শিল্প তার সামনের দিকে।

অন্যদিকে, অটোমোবাইল শিল্পে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে না। টাকার হিসাবে তাদের মজুরি কিছু বাড়লেও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তা তাল রাখতে পারছে না। প্রকৃত মজুরি কমছে। গত দশকের পুরোটা জুড়েই প্রকৃত মজুরি কমেছে। ২০০০-০১ থেকে ২০০৯-১০ সালের মধ্যে প্রকৃত মজুরি কমেছে ১৮.৯ শতাংশ।

অন্য দিকে, শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন কিন্তু বাড়ছে। শ্রমিক-প্রতি সংযুক্ত মূল্য ২০০০-০১ সালে ছিল ২.৯ লক্ষ টাকা, ২০০৯-১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৯ লক্ষ টাকা। মাঝে শিল্পে যে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল তা সত্ত্বেও শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন এক দশকে এতটা বেড়ে গেছে। কিন্তু শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি সেখানে নিয়মিতভাবে কমে গেছে।

ফলে শ্রমিকরা যে উৎপাদন করেন বা মূল্য যুক্ত করেন তার কতটা অংশ শ্রমিকরা পাচ্ছেন তার হিসেব কষলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-০১ সালে শ্রমিকরা যুক্ত-মূল্যের ২৭.৪ শতাংশ পেতেন মজুরি হিসাবে, ২০০৯-১০ সালে সেই অংশটা কমে এসেছে ১৫.৪ শতাংশে। বাকি অংশটা যাচ্ছে মালিকদের কাছে।

মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বে ব্যাপারটা এভাবে দেখা হয়। শ্রমিক সারাদিনে যে উৎপাদন করছে তার একটা অংশ সে পায় তার শ্রমশক্তির মূল্য হিসাবে মজুরি রূপে। বাকি সময়টা তার শ্রমে উৎপাদিত পণ্য যায় উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে পুঁজিপতির কাছে। তার থেকে পুঁজিপতিকে আবার খানিকটা অংশ দিতে হয় ব্যাংক-কে সুদ হিসাবে, জমির মালিককে খাজনা হিসাবে, ম্যানেজমেন্টের লোকদের বেতন হিসাবে ইত্যাদি।

এভাবে দেখলে, ২০০০-০১ সালে ৮ ঘন্টার শ্রমদিবসে শ্রমিক নিজের ও নিজের পরিবারের টিকে থাকার জন্য উৎপাদন করত ২ ঘন্টা ১২ মিনিট, বাকি ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট সে উৎপাদন করত পুঁজিপতির জন্য। আর ২০০৯-১০ সালে এসে সে নিজের জন্য উৎপাদন করে মাত্র ১ ঘন্টা ১২ মিনিট, বাকি ৬ ঘন্টা ৪৮ মিনিট করে পুঁজিপতির জন্য।

অবস্থার এরকম অধোগতি হলো কী করে? উন্নত প্রযুক্তির ফলে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, শুধু তা দিয়ে এটার ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, মনে রাখতে হবে, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরিও কমেছে। কমেছে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে।

মালিকরা মজুরি কমাতে চায়, শ্রমিকরা চায় মজুরি বাড়াতে। এ নিয়ে মালিক-শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম চলতে থাকে। কখনো মালিকরা সক্ষম হয় প্রকৃত মজুরি কমাতে। যার অর্থ, শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যের কম দেওয়া হয় মজুরি হিসাবে। কিংবা বেশি খাটিয়ে তার কাছ থেকে বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে নেওয়া হয়। আবার কখনো শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে, সংগ্রাম করে, সক্ষম হয় মজুরি বাড়াতে বা শ্রমদিবস কমাতে। নিজেদের অবস্থাকে একটু ভালো করতে।

অটোমোবাইল শিল্পে অলিখিত আইন হলো শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দেওয়া হবে না। মারুতি-সুজুকি কারখানায় আন্দোলনের মূল দাবিই ছিল ইউনিয়ন করার অধিকার।

ইউনিয়ন করার চেষ্টা করলে মালিকরা ছাঁটাই করে, নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা লাগিয়ে দিয়ে, মারধোর করে, গুন্ডা লাগিয়ে, এমনকি খুনজখম করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। সব কারখানায় একই গল্প। হুন্ডাই, হিরো হন্ডা, ওনজিন, মারুতি সুজুকি, রিকো অটো, সব জায়গায়। হিরো হন্ডার ধারুভেরা কারখানায় ১৮০০ ক্যাজুয়াল শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়, নেতাদের নামে অস্ত্র আইনে মামলা লাগিয়ে দেওয়া হয়। কারণ তারা নিজেদের ইউনিয়ন করতে চেয়েছিল। মারুতি সুজুকিতে তো ১৪৭ জনকে জেলে পাঠানো হয়েছে আর ২৫০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। ২০০৯ সালে গুরগাঁওয়ের রিকো কারখানায় গুন্ডাদের দিয়ে শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। একজন শ্রমিক মারা যায়।

এসব ক্ষেত্রে সরকারও সাধারণভাবে মালিকপক্ষের সাথেই থাকে। মারুতির ঘটনায় তো হরিয়ানা রাজ্য সরকার সরাসরি মালিকপক্ষের হয়েই কাজ করেছে। মালিকপক্ষ চায় আরো ক্ষমতা। কিছু কিছু অটোমোবাইল কারখানা এখন গুজরাটে চলে যাচ্ছে। সেখানে মালিকদের স্বর্গরাজ্য। ইউনিয়ন-হীন সাম্রাজ্য।

ইউনিয়ন না করতে দিয়ে শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতা কেড়ে নিলে দিন দিন প্রকৃত মজুরি কমানো সম্ভব হয়। পাশাপাশি আরও কিছু ব্যবস্থা রয়েছে মালিকদের হাতে। স্থায়ী শ্রমিক কমিয়ে চুক্তি শ্রমিক, ট্রেনি শ্রমিক, অ্যাপ্রেন্টিস— এদের নিয়োগ করা। এদের মজুরি কম। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হয় না। গুরগাঁও-মানেসর-বাওয়াল অঞ্চলে মোট ১০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৮০ শতাংশই বিভিন্ন ধরনের চুক্তি শ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক। মারুতি সুজুকির মানেসর প্ল্যান্টে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৯৭০, আর আছে ৪০০-৫০০ জন ট্রেনি, ১১০০ চুক্তি শ্রমিক, ২০০-৩০০ জন অ্যাপ্রেন্টিস।

চুক্তি শ্রমিকদের মাইনে কম, মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বাড়ে না। তাদের প্রকৃত মজুরি দারুন হারে কমছে। তাই তাদের পিঠও আজ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে তারা।

অবশ্য এমন নয় যে শুধু অটোমোবাইল শিল্পেই প্রকৃত মজুরি কমছে। ২০০০-০১ থেকে ২০০৯-১০-এর মধ্যে সমগ্র কারখানা সেক্টরেই প্রকৃত মজুরি কমেছে, তবে কমার হার অটোমোবাইল শিল্পের মতো এত বেশি নয়।

শুধু শিল্পক্ষেত্রেই নয়, গ্রামেও ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ সালের মধ্যে প্রকৃত মজুরি কমছে। তাতে অটোমোবাইল শিল্পের তত ক্ষতি নেই। কারণ তারা তো সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্য তৈরি করে না। তবে সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্য যারা তৈরি করে তাদের ব্যবসা এতে মার খাবে। অন্যদিকে এতে আবার অটোমোবাইল সহ সব শিল্পে মালিকদের একটা সুবিধাও হচ্ছে। গ্রামে মজুরি কমলে শহরে মজুরি দাসত্ব করার জন্য সস্তায় শ্রমিকের যোগান বাড়বে।

তথ্যসূত্র: 'Behind the Present Wave of Unrest in the Auto Sector', *Aspects of Indian Economy*, Vol. 52

ধারাবাহিকতায় মারুতির শ্রমিক আন্দোলন

অরিজিৎ

শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ নিথরতার মাঝে গত দু বছর ধরে চলা মারুতির শ্রমিকদের আন্দোলন নতুন করে সংগ্রামী মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। মালিকশ্রেণী, সরকার আর স্থানীয় প্রশাসনের তীব্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও শ্রমিকদের অনড় মনোভাব এই আন্দোলনকে এক উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে।

আটের দশকে বিশ্বায়নের নীতির হাত ধরেই তৈরি হয় গুরগাঁও-এর শিল্পাঞ্চল। শ্রম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এই অঞ্চল। ৭০-৮০ শতাংশ শ্রমিককে ঠিকা প্রথায় নিয়োগ করা হয়; যদিও তারা স্থায়ী কাজই করে তবু বেতন অর্ধেক, কাজ চলে যাওয়ার অনিশ্চয়তা, সংগঠিত হতে না দেওয়া— এক কথায় একটা অগণতান্ত্রিক বাতাবরণ।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১১-র মাঝামাঝি। ইউনিয়ন করার অধিকারের দাবিতে জুন মাসে প্রথম দফার স্টাইক করে শ্রমিকরা। শ্রমিকদের ঐক্য আঁচ করতে পেরে জুলাই মাসেই কর্তৃপক্ষ মন্থর উৎপাদন আর কাজে ফাঁকির অজুহাত খাড়া করে কিছু শ্রমিককে সাসপেন্ড করে এবং বাকিদের বন্ড সই করে ঢোকার নির্দেশ জারি করে। এর প্রতিক্রিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে এক মাস টানা স্ট্রাইক হয়— কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে সাসপেন্ড হওয়া শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিলেও কয়েকদিনের মধ্যে আবার ১২০০ ঠিকা শ্রমিককে বের করে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৮ থেকে ১৭ অক্টোবর চলে তৃতীয় দফার ধর্মঘট। সুজুকি পাওয়ারট্রেন ও বাইক প্ল্যান্ট স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করে। বাজাজ অটো সমেত অনেক কারখানার শ্রমিকরা মারুতির আন্দোলনের সমর্থনে স্ট্রাইক করে। শ্রমিকদের অনড় মনোবল ভাঙতে ময়দানে নামে কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে দীর্ঘ বৈঠকে তাদের ওপর মানসিক চাপ তৈরি করে ও বিরাট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। পাশাপাশি তারা ৩০ জন শ্রমিককে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে; যাতে নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস বাড়ে শ্রমিকদের। অথচ দেখা যায় এতে মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর অনাস্থা বাড়ে সাধারণ শ্রমিকদের। নতুন করে সংগঠিত হয় শ্রমিকরা। ২০১২-এর

জানুয়ারিতে শ্রমিকরা ফের ইউনিয়নের জন্য আবেদন জানায়। বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ রাখা যাবে না আর কোনো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অ্যাফিলিয়েশন নেওয়া যাবে না— এই মর্মে দাবি মঞ্জুর হয়। গুরগাঁও শিল্পাঞ্চল বাংলার মতো নয়। মালিকদের অনুমোদন না থাকলে শ্রম দপ্তর ইউনিয়নের অনুমতি দেয় না। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে স্বীকৃতি পায় ইউনিয়ন। যদিও AITUC বা HMS-এর মতো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো সারা ভারতের মতোই গুরগাঁও শিল্পাঞ্চলেও মালিকের দালালি করে, তবুও ম্যানেজমেন্টের আধিপত্য সর্বাত্মক করার উদ্দেশ্যেই এমন পথে হাঁটে কর্তৃপক্ষ। প্রথম সারির নেতাদের অনুপস্থিতি আর নেতৃত্বের প্রতি শ্রমিকদের সম্ভাব্য অবিশ্বাসের তত্ত্বে মালিকশ্রেণী আস্থা রাখতে পারেনি। রেজিস্ট্রেশন পেলেও গেটের বাইরে কোনোরকম সভা করার অনুমতি দেয়নি কর্তৃপক্ষ। মে, ২০১২ থেকে অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ আর মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে দাবিসনদের আলোচনা শুরু হয়। ১৬ই জুলাই কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, তারা ঠিকা বা ক্যাজুয়ালদের ব্যাপারে ইউনিয়নের সাথে কোনো কথা বলবে না। এক অসম্মানজনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয় শ্রমিকদের। শ্রমিকদের চাপা বিক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ হয় এর ঠিক দুদিন পরে। এক সুপারভাইজার এক দলিত শ্রমিককে জাতপাত তুলে কটূক্তি করায় প্রতিবাদ করে সেই শ্রমিক। ম্যানেজমেন্ট সেই সুপারভাইজারের বদলে তৎক্ষণাৎ সেই শ্রমিকটিকে বরখাস্ত করে। অপমানিত শ্রমিকরা একজোট হয়ে এই অন্যায় সাসপেনশন প্রত্যাহার ও সুপারভাইজারটির শাস্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেও কোনোরকম সদর্থক ভূমিকা দেখতে পান না শ্রমিকরা। শ্রমিকরা যখন কারখানায় অবস্থান করছে তখন মালিকের পোষা গুন্ডাবাহিনী কারখানায় ঢোকে, যাদের ওখানে স্থানীয়ভাবে বাউন্সার বলে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালায় গুন্ডাবাহিনী, ম্যানেজমেন্টের একাংশ সহ হরিয়ানা পুলিশ। সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করা হয়। গুন্ডাবাহিনী কোম্পানির সম্পত্তির একাংশ ধ্বংস করে, আগুন লাগায় যত্রতত্র, শতাধিক শ্রমিক আহত হয়। চক্রান্তমাফিক এক শ্রমিকদরদী ম্যানেজারকে খুনও করে তারা। পরদিন থেকে হরিয়ানা সরকার, মালিকপক্ষ, মিডিয়া একযোগে যে কোনো মূল্যে শ্রমিকদের দোষী সাব্যস্ত করতে নেমে পড়ে। পুলিশও ধরপাকড় শুরু করে দেয়। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে ১৪৭ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ, আর ৫৪৬ জন স্থায়ী ও ১৮০০ জন ঠিকা-শ্রমিককে ছাঁটাই করে কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বও যখন জেলবন্দী, তখন তৃতীয় দফার নেতৃত্ব উঠে আসে গোটা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি লাগাতার মিটিং, মিছিল, কনভেনশন, গণবিক্ষোভ, দেশজোড়া প্রতিবাদ, অনশন কর্মসূচির মাধ্যমে লড়াই জারি রেখেছেন লড়াকু শ্রমিক আর তাদের পরিবারবর্গ। ৯ই ডিসেম্বর, ২০১২ সমস্ত অটোমোবাইল শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং প্রায় একশোর বেশি কারখানায় প্রচারে যাওয়া হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭টি রাজ্যের ৩১টি জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত এপ্রিল মাসে কৈথাল জেলায় শিল্পমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে প্রথমে অবস্থান ও পরে অনশনে বসে শ্রমিকরা। আন্দোলনের চাপে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করতে বাধ্য হন এবং কিছু প্রতিশ্রুতিও দেন। কৈথালে এখনো অবস্থান চলছে, কারণ গোটা গুরগাঁওতে শ্রমিকদের ধরনায় বসার অনুমতি দিচ্ছে না প্রশাসন, মানেসর প্ল্যান্ট কার্যত এখন পুলিশ ছাউনি, বন্দুকের নলের সামনে কাজ করতে হচ্ছে শ্রমিকদের।

ছাঁটাই, চার্জশিট, সাসপেনশন, নেতৃত্বকে ঘুষ খাওয়ানো, জোর করে ইস্তফা দেওয়ানো, জেলে বন্দী রাখা, পুলিশি হেফাজতে মারধোর— কোনো কিছু দিয়েই এই আন্দোলনকে দমাতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। হরিয়ানায় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের চরিত্র আর রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কোনোটাই পশ্চিমবঙ্গের মতো নয়। তাই শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তবতাও ওখানে স্বতন্ত্র। নতুন শিল্পাঞ্চল, একঝাঁক সদ্যযুবক শ্রমিকবাহিনীই এই আন্দোলনের মূল জীবনীশক্তি। সাধারণ শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের ওপর সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং লড়াইতে শ্রমিক পরিবারগুলোর যোগদান আন্দোলনে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। তাই একাধিকবার আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করার চেষ্টা করলেও আদপে কোনো ফলই পায়নি কর্তৃপক্ষ। জাতপাত বা প্রাদেশিকতার সেন্টিমেন্ট থাকলেও আপাতত শ্রমিকসত্তার জায়গা থেকে সেসবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন শ্রমিকরা, যা অবশ্যই আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগিয়েছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রভাবকে এই আন্দোলন চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে আর তাদের দ্বিচারিতাকে ফাঁস করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে মারুতি শ্রমিকদের এই দুই বছরের আন্দোলন কোম্পানি, প্রশাসন, সরকার, আদালত, মিডিয়া আর ভ্রষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে গুরগাঁও শিল্পাঞ্চলে এক নতুন সংগ্রামী ধারার বার্তা বহন করে এনেছে।

লড়াই জারি থাকবে শ্রমিকদের। সেই লড়াইয়ের সমর্থনে গোটা দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি হতে থাকবে— আমরাও নজর রাখব আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর ওপর, বোঝার চেষ্টা করব মালিক আর সরকারগুলোর শ্রমিকবিরোধী নীতিগুলোকে আর সেই সাথে দেখব একটা কারখানা, একটা ট্রেডের, কিছু অর্থনৈতিক কিছু গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া থেকে শ্রমিক আন্দোলন কতটা রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারে।

অটোমোবাইল শিল্প

জেলের চিঠি

মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পুরো কমিটিটাকেই গুরগাঁও কেন্দ্রীয় জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনো ন্যায়বিচার ছাড়া, এমনকি জামিন ছাড়াই রয়েছেন ১৪৭ জন শ্রমিক। এই পত্রটি তাদের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। অনুবাদ আমাদের।

ন্যায়ের জন্য আমাদের পাশে দাঁড়ান

আমরা মারুতি সুজুকির শ্রমিক, গত ১৮.৭.২০১২ থেকে একটা চক্রান্তের অংশ হিসাবে যারা জেলে বন্দী, কোনোরকম সঠিক অনুসন্ধান ছাড়াই। আমরা ১৪৭ জন গুরগাঁও কেন্দ্রীয় জেলে বন্দী হয়ে আছি। জুলাই মাস থেকে ২৫০০ জন স্থায়ী ও চুক্তি শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হয়েছে। গত ৮ মাসেরও বেশি সময় ধরে আমরা প্রায় প্রতিটি প্রশাসনিক আধিকারিক, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহ প্রায় প্রতিটি জনপ্রতিনিধির কাছে আবেদন পাঠিয়েছি। কিন্তু এইসব আবেদনে কেউ কান দেয়নি, আমরা জামিনও পাই নি।

হরিয়ানা পুলিশ আদালতে যে চার্জশিট পেশ করেছে তাতে কোনো সাক্ষীর নাম নেই, তাই ঐ চার্জশিট অসম্পূর্ণ। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর স্বেচ্ছাচারী ভাবে যে ধারাবাহিক আক্রমণ চলছে তারই একটা ঝলক দেখা যায় এর মধ্য দিয়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি। আইন কীভাবে কোম্পানি মালিকদের পক্ষে ঝুঁকে থাকে। আমাদের সঙ্গী শ্রমিকদের অনেকেরই বাবা-মা বা অভিভাবক নেই, সংসারের পুরো দায় তাদের ঘাড়ে।

আমাদের যখন জেলে ঢোকানো হলো তখন শ্রমিকদের অনেকের স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। তাদের সন্তান প্রসবের সময় হলেও সেই শ্রমিকদের জামিন দেওয়া হলো না, এমনকি প্যারোলেও ছাড়া হলো না। আমরা জানতেও পারছি না কী অবস্থায় তাদের প্রসব হচ্ছে। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি:

১। আমাদের একজন সহ-শ্রমিক, সুমিত, পিতা: (প্রয়াত) শ্রী চান্তার সিং। তার পরিবারে স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই। তা সত্ত্বেও, গত ৬ জুন ২০১২ তার স্ত্রী যখন গুরগাঁও-এর একটি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেন, তখন সুমিতের জামিনের আবেদন বা প্যারোলে যাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়।

২। আমাদের একজন সহ-শ্রমিক বিজেন্দ্র, পিতা দালেল সিং, ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, গত ১০ জানুয়ারি তাঁর পুত্রবধূ যখন একটি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেন তখন তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন নি, তার সঙ্গে হাসপাতালে যেতেও পারেন না। তা সত্ত্বেও বিজেন্দ্রকে জামিন দেওয়া হয়নি, প্যারোলেও ছাড়া হয়নি।

৩। আমাদের এক সহ-শ্রমিক রামবিলাস, পিতা: শ্রী সিলাক রাম। রামবিলাসকে জেলে পাঠানোর পর তার ঠাকুমা অসুস্থ হয়ে পড়েন, কারণ রামবিলাস ছিল তাঁর খুব স্নেহের পাত্র, এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠাকুমা মারা যান। ঠাকুমা যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন বা তাঁর অন্তিম সংস্কারের সময়ও রামবিলাসকে প্যারোলে ছাড়া হয় নি। তার কয়েকদিন পর তার স্ত্রীর প্রসবের সময় এলেও তার জামিনের বা প্যারোলের আবেদন গ্রাহ্য হলো না। এর ফলে তার মানসিক আঘাত লাগে।

৪। আমাদের একজন সহ-শ্রমিক প্রেমপাল, পিতা: শ্রী ছান্দিলাল, তার একার ওপর সংসারের দায়িত্ব। পুরো সংসারটার খাওয়া-পরা নির্ভর করে তার উপার্জনের ওপর। যখন তাকে হঠাৎ করে জেলে পুরে দেওয়া হলো, তার দু বছরের মেয়ে বাবাকে না দেখে কেঁদে কেঁদে অসুস্থ হয়ে পড়ে, ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সেই আঘাত সারার আগেই তার মা-ও ছেলের জেল আর নাতনির মৃত্যুর শোকে অসুস্থ হয়ে মারা যান। এর পরও তার এক সপ্তাহের প্যারোলের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টির পরের দিন তাকে মাত্র এক ঘন্টার প্যারোলে ছাড়া হয়। তার স্ত্রী বাড়িতে একা, কন্যার মৃত্যু ও শাশুড়ির মৃত্যুশোকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে দিতে হয়। এখনো সে অসুস্থ। তাকে দেখার কেউ নেই। এ সমস্ত প্রেমপালের পক্ষে ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে।

৫। আমাদের আর এক সহ-শ্রমিক রাহুল, পিতা: বিনোদ রতন, বাবা-মার একমাত্র পুত্র, এক বোনও আছে। ১৬ নভেম্বর, ২০১২ তার বোনের বিয়ে হয়। কন্যাদান অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে প্যারোলে ছাড়া হলো না। পরিবারের একমাত্র কন্যার বিয়ে হলো এক নিরানন্দ পরিবেশে। রাহুলের এই ক্ষত এখনো নিরাময় হয়নি।

৬। আমাদের এক সহ-শ্রমিক সুভাষ, পিতা: শ্রী লাল চাঁদ, ছিল তার ঠাকুমার খুব আদরের। ওর জেল হওয়ার পর ওর ঠাকুমা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেন। সব সময় তিনি নাতির কথা ভাবতেন। মনের দুঃখে তিনি মারা যান। কিন্তু সুভাষকে তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে প্যারোলে ছাড়া হয় নি।

এরকম আরো সব ঘটনা আমাদের জীবনে প্রতিদিন ঘটে চলেছে। সব লিখলে একটা বই হয়ে যাবে।

আমাদের সম্পর্কে : আমাদের পরিচয়, পরিবার, কাজকর্ম

আমরা সবাই শ্রমিক বা কৃষক পরিবারের সন্তান। আমাদের বাবা-মা অনেক চেষ্টায়, অনেক আত্মত্যাগে আমাদের দশ ক্লাস, বারো ক্লাস বা আইটিআই পড়িয়েছেন। আমরা যাতে জীবনে কিছু করতে পারি, প্রয়োজনে পরিবারকে সাহায্য করতে পারি তার জন্য নিজের পায়ে আমাদের দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন তাঁরা।

আমরা সবাই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করে মারুতি সুজুকি কোম্পানিতে যোগ দিই কোম্পানির দেওয়া শর্তে। যোগ দেওয়ার আগে কোম্পানি আমাদের সম্পর্কে সব রকম অনুসন্ধান করে, আমাদের বাসস্থানের পুলিশি অনুসন্ধান করে, আমাদের কোনো অপরাধমূলক কাজকর্মের কোনো ইতিহাস আছে কিনা তা দেখে। আমাদের কারোরই কোনোরকম অপরাধমূলক কাজকর্মের পূর্ব-ইতিহাস নেই।

আমরা যখন কোম্পানিতে যোগ দিই, কোম্পানির মানেসর প্ল্যান্ট তখন তৈরি হচ্ছে। সেই সময় আমরা ভেবেছিলাম প্ল্যান্টের ভালো হলে আমাদেরও ভালো, আর তাই মানেসর প্লান্টকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দারুণ পরিশ্রম করি, প্রচুর শক্তি ব্যয় করি। সারা বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমরা তখন এক বছরে সাড়ে দশ লক্ষ গাড়ি উৎপাদনের জন্য দৈনিক দু ঘন্টা বেশি কাজ করছি।

কোম্পানির যে মুনাফা, আমরাই তার সৃষ্টিকর্তা। আর আজ আমাদের অপরাধী হিসেবে, খুনি হিসাবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে আমরা 'চিন্তাভাবনা না করে আগুন লাগিয়েছি'।

আমাদের প্রায় সবাই এসেছি গরিব শ্রমিক বা কৃষক পরিবার থেকে। আমাদের পরিবারগুলি আমাদের চাকরির উপর নির্ভরশীল। আমাদের স্বপ্ন সার্থক করার জন্য, আমাদের পরিবারগুলির ভবিষ্যতের জন্য, যেমন নিজের বাড়ি, আমাদের ভাইবোনদের ও সন্তানদের ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা সংগ্রাম করছিলাম, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়, বাবা-মা, যারা তাদের বড়ো করার জন্য এত কষ্ট করেছেন, তাদের জন্য এক স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এনে দেওয়া যায়।

কিন্তু এর বদলে কোম্পানি আমাদের যতভাবে সম্ভব শোষণ করতে থাকে, যেমন:

১। কাজ করতে করতে কোনো শ্রমিক যদি অসুস্থ বোধ করে তাকে ডিসপেনসারিতে যেতে দেওয়া হয় না, সেই অবস্থাতেই তাকে কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়।

২। চা পানের বিরতি বা খাওয়ার বিরতি ছাড়া অন্যসময়ে আমাদের বাথরুমে যেতেও অনুমতি দেওয়া হতো না।

৩। ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করত, গালাগাল দিত, এমনকি তাদের চড় মারত, মুর্গা বানাতো।

৪। নিজের অসুস্থতার কারণে, কিংবা কোনো দুর্ঘটনা বা বাড়িতে কোনো বড় সমস্যার জন্য অথবা কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য যদি কোনো শ্রমিক ৩-৪ দিনের ছুটি নিতে বাধ্য হতো, তবে তার মাসমাইনের অর্ধেক, অর্থাৎ প্রায় ৯০০০ টাকা কোম্পানি কেটে নিত।

সর্বদা এইরকম শোষণ চলবার কারণে শ্রমিকরা একটি ইউনিয়ন তৈরির প্রয়োজন বোধ করে। মারুতি সুজুকি কোম্পানি এই ইউনিয়নের ব্যাপারটার বিরুদ্ধে ছিল। সেজন্য ২০১১ সালে তিনটি স্ট্রাইক হয়। তৃতীয় স্ট্রাইকের পর, স্ট্রাইকে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের ৩০ জন শ্রমিককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু ২০১২-র ফেব্রুয়ারিতে আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের ইউনিয়ন নথিভুক্ত করতে সমর্থ হই। সে সময়কার মানবসম্পদ ম্যানেজার, প্রয়াত শ্রী অভনিশ কুমার দেব আমাদের সাহায্য করেন। আমাদের সাহায্য করার জন্য কোম্পানি শ্রী দেবের ওপর রেগে যায়। ফলে শ্রী দেব কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু কোম্পানি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নি। তাদের ভয় ছিল, তাদের দুষ্কর্মগুলি বুঝি মানুষের সামনে চলে আসবে পড়ে যাবে। ইউনিয়ন ভেঙে দিতে ও শ্রীদেবকে সরানোর জন্য কোম্পানি একটা মতলব ভাঁজে। ১৮ জুলাই ২০১২ গুন্ডাবাহিনী ঢুকিয়ে তারা ''দুর্ঘটনাটি'' ঘটায়।

জেলে বন্দী শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা

আমাদের, মোট ১৪৭ জন শ্রমিককে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে, কোনো অনুসন্ধান ছাড়াই। আর তখন থেকে ৮ মাসের বেশি হয়ে গেছে আমরা জেল-বন্দী। আমাদের অনেকেরই টিবি, অর্শ, মানসিক সমস্যা ও অন্যান্য নানা রোগ হয়েছে।

আমাদের প্রায় সবাই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে, আর আমরা এখন জেলে। এর ফলে আমাদের পরিবারগুলো খিদেয় মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। পরিবারের মেয়েদের ও শিশুদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে, যেটা তাদের মৌলিক অধিকার। আমাদের ও আমাদের পরিবারগুলোর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে গেছে। পরিবারের অন্য সদস্যরাও মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত। আমাদের ভয়, এই মানসিক চাপের কারণে তারা যেন কোনো ভুল না করে বসে।

জেলের বাইরে ছাঁটাই শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা

১৪৭ জন শ্রমিককে জেলে পাঠানো ছাড়াও কোম্পানি প্রায় ২৫০০ নিয়মিত ও চুক্তি শ্রমিকদের ছাঁটাই করেছে, কোনো অনুসন্ধান না চালিয়েই। এই শ্রমিকরা এখন বেকার। তাদের পরিবারগুলোর অবস্থাও খুব খারাপ। অবস্থা এরকম যে তাদের কাজের অভিজ্ঞতার কোনো প্রমাণও তাদের হাতে নেই। তাদের কেরিয়ার অন্ধকারে। আর তাদের কেউ যদি আমাদের সমর্থনে

এর পর ২১ পৃষ্ঠায়

চাপা পড়া মানুষ : বাংলাদেশে গারমেন্ট শিল্প ও তার শ্রমিক

মিতা দত্ত

সাভার অঞ্চলে তখনও কান্না থামেনি... গারমেন্ট ফ্যাক্টরির বিল্ডিং ধসে পড়েছিল রাত একটায়। বিনিদ্র রজনীতে শত শত শ্রমিক বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মহান ব্রতে নিযুক্ত ছিলেন।

না। এটা এবছরের ২৪ এপ্রিলের বাংলাদেশের খবর নয়। খবরটা ২০০৬ সালের। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি?

... আবারো গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিতে আগুনে পুড়ে ছাই হলেন শ্রমিকরা, প্রধানত নারী। এবারে কত সংখ্যা? কেউ আসলে ঠিক বলতে পারে না। সন্ধ্যায় রাতের শিফ্টের জন্য বিশেষভাবে খাবারের কথা বলা হয়েছিল প্রায় হাজার শ্রমিকের।

না। এটাও গত ২৪ নভেম্বর আশুলিয়া সাভার অঞ্চলের ঘটনা নয়। ২০০৬ সালের ঘটনা। কারখানাটি চট্টগ্রামে।

একবার দুবার একটা ঘটনা ঘটলে সেটা নেহাত দুর্ঘটনা হতে পারে। কিন্তু বার বার, বছরের পর বছর, একই ঘটনা ঘটতে থাকলে তাকে আর নেহাত দুর্ঘটনা বলা যায় না। এটা হয়ে যায় এমন এক ঘটনা, যা হওয়ারই কথা ছিল। আর তার জন্য দায়ী কিছু মানুষ। তবে এসব কথার বিশদে যাওয়ার আগে সাভারের রানা প্লাজার ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিই।

সাভারের বাড়ি ভেঙে গারমেন্ট শ্রমিকদের মৃত্যু

গত ২৪ এপ্রিল বৃহত্তর ঢাকার অংশ সাভার অঞ্চলে একটি ন-তলা বাড়ি ভেঙে পড়ে মারা যান ১১২৭ জন (ঘটনার ১৯ দিন পরের সরকারি হিসেব)। আহত আরও ২৫০০ জন। অন্তত ২৫০০ জনকে সেই ভেঙে পড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। তাদের একজন, রেশমা, উদ্ধার পায় ১৭ দিন পরে, জীবিত অবস্থায়। রেশমার বয়স ১৮ বছর।

এ ঘটনাটি পোষাক শিল্পের সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে। শুধু তাই নয়, একটি বাড়ি নিজে থেকে ভেঙে পড়ার ঘটনার মধ্যেও প্রাণহরণের নিরিখে এটি বিশ্বে সবচেয়ে বড় ঘটনা। (নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনায় অবশ্য এর চেয়ে বেশি জন নিহত হয়েছিলেন- এরোপ্লেনটির যাত্রী ইত্যাদি ধরে মোট ২৭৫২ জন। কিন্তু সে বাড়ি তো নিজে নিজে ভেঙ্গে পড়ে নি, তাকে ভাঙা হয়েছিল।)

রানা প্লাজা নামের এই বাড়িটির মালিক সোহেল রানা। স্থানীয় আওয়ামী লীগের যুব শাখার নেতা। ঘটনার কয়েকদিন পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাড়িটিতে ছিল বেশ কিছু দোকান, ব্যাংক আর ৫টি গারমেন্ট কারখানা, যাতে কাজ করতেন প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক। দোকানগুলো আর ব্যাংক ছিল নিচের তলায়। ঘটনার আগের দিন বাড়ির দেওয়ালে ফাটল দেখা দেয়। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে বাইরে চলে আসেন। স্থানীয় উপ-জেলা প্রকৌশলী ও শিল্প পুলিশের একটি টিম ভবনটি পরিদর্শন করে বন্ধ রাখার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ মেনে দোকানগুলি ও ব্যাংক বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু গারমেন্ট কারখানাগুলির মালিকরা একদিনের জন্যও কারখানা বন্ধ করতে রাজি হন নি। তারা শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়ে কাজে পাঠান। একটি কারখানার মালিক তো কাজে না গেলে এক মাসের মাইনে কেটে নেবার হুমকিও দেন। তারই ফল এত মৃত্যু।

রানা প্লাজার স্থপতি মাসুদ রেজা জানিয়েছেন, বাড়িটি তৈরি হয়েছিল দোকান আর অফিস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। কারখানা হিসেবে নয়। বাড়িটির সরকারি অনুমোদনও শপিং মল ক্যাটিগরিতে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের অধিকর্তা আলি আহমেদ খান জানিয়েছেন, বাড়িটির উপরের চারটি তলা তৈরি হয়েছিল বিনা অনুমতিতে, বেআইনি ভাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের প্রচলিত বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ, নিম্ন মানের সরঞ্জাম ব্যবহার, মজা পুকুরের ওপর তৈরি এই ভবন গড়ার আগে নিয়মমাফিক পাইলিং না করা, এবং তার ওপর কারখানার ভারি ভারি যন্ত্রপাতি ও কাজের সময় যন্ত্রের কম্পন বাড়িটি ভেঙ্গে পড়ার জন্য দায়ী।

ফলে একথা বলাই যায় যে, বাড়িটি যে কোনো দিন দুর্ঘটনা ঘটবার অপেক্ষায় ছিল। আর তার জন্য একদিকে দায়ী বাড়ি মালিক। অন্যদিতে শ্রমিক মৃত্যুর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না মুনাফালোভী সেই কারখানা-মালিকরাও, বাড়িটিতে ফাটল দেখা দেওয়ার পরও যারা জোর করে শ্রমিকদের কারখানায় কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশ গারমেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা সাহায্য ঘোষণা করেছে।

এ ঘটনার পর মে দিবসে হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল বের করে কাজের জায়গায় সুরক্ষার দাবি জানান। তাদের আর একটা দাবি ছিল বাড়ির মালিক সোহেল রানার মৃত্যুদণ্ড।

চলেছে মৃত্যু-মিছিল

কয়েকমাস আগেই, ২৪ নভেম্বর ২০১২ আশুলিয়ার তাজরিন ফ্যাশন হাউসে আগুন লেগে মারা যান ১২৫ জন (মতান্তরে ন্যূনতম ৩০০ জন)। শর্ট সার্কিট হয়ে এই ন-তলা বাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। কারখানায় প্রচুর পরিমাণ কাপড়, বিশেষ করে সিন্থেটিক কাপড় কারখানাটিকে অচিরেই জতুগৃহে পরিণত করে।

টুবা গ্রুপের এই কারখানাটিতে কাজ করতেন ১৬৩০ জন শ্রমিক। বাড়িটিতে কোনো এমারজেন্সি গেটও ছিল না। এই ঘটনা নিয়ে বেশ হইচই হয়। বাঁচার চেষ্টায় লাফ দিয়ে মারা যান ১২ জন। ফায়ার সার্ভিস, পরিবেশ দপ্তর, বিজিএমইএ (গারমেন্টস মালিকদের সংগঠন) সহ সংশ্লিষ্টরা দুর্বল পরিকাঠামোর ঝুঁকিপূর্ণ গারমেন্ট কারখানা ভবনগুলি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। অবশ্য এই ঘোষণা অনুযায়ী কাজ কতটুকু হয়েছে, সাভারের ঘটনাই তা বলে দিচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাজরিন-এর মালিককে তারা গ্রেপ্তারও করে নি।

গারমেন্ট শিল্পে আগুনে পুড়ে বাড়ি ধসে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা অগুনতি। শুধুমাত্র জাতীয় দৈনিক সাপ্তাহিক সংবাদ-মাধ্যমে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০ সাল থেকে শুধু ৭৫টি গার্মেন্টিস কারখানায় আগুনে পুড়ে, ভবন ধসে ও আগুনের আতঙ্কে পদদলিত হয়ে নির্মম মৃত্যু বরণ করেছেন ১৫০০ জনের বেশি শ্রমিক, আহত হয়েছেন পাঁচ সহস্রাধিক। আর তার চেয়েও ভয়ংকর সত্য হলো, এই সব ঘটনার জন্য একজন গারমেন্ট মালিকেরও শাস্তি হয়নি।

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আগুন লাগে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কেটিএস গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিতে। কত জন মারা গিয়েছিলেন সেটা কেউ বলতে পারে নি। তবে ১০০০ জনের জনের জন্য রাতের খাবারের কথা বলা হয়েছিল। অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী আনু মুহাম্মদ তার তিনদিন পরে জায়গাটি পরিদর্শনে যান। তিনি দেখেন, ''কারখানাটি গলির ভেতর। একটা ট্রাক ঢুকে সহজে বের হতে পারে না। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি কী করে দরকারমতো আসবে এখানে? আসতে পারে নি।''

কারখানাটির সিঁড়ি প্রশস্ত, গেটও একাধিক। কিন্তু সিঁড়িগুলো ব্যবহার হচ্ছিল প্রায় গুদাম হিসেবেই। গেটগুলো থাকে কড়া পাহারায়, বন্ধ। আগুন লাগার সময়ও গেটগুলো ছিল বন্ধ। আগুনের ভয়াবহতা দেখে পাহারাদার চাবি খুলে দেবার বদলে চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আশপাশের সব কারখানা থেকে শ্রমিকরা ও আশপাশের অনেক মানুষ ছুটে এসেছেন সাহায্য করতে। কিন্তু গেট বন্ধ থাকার জন্য তারাও ঢুকতে পারেননি। শ্রমিক মেয়েরা ছাদ, চারতলা তিনতলা দোতলার ব্যালকনি দিয়ে লাফ দিয়েছে।

আশপাশের সাহায্যকারীরা সাহায্য করার বা গেট ভাঙার সুযোগও পাননি বেশিক্ষণ। খুব দ্রুত সেখানে পুলিশ চলে আসে, চলে আস র‍্যাব (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন)। ঘেরাও করে ফেলে পুরো কারখানা। পাহারা চলে কয়েকদিন ধরে। মালিকপক্ষ অবশ্য ভেতরে যেতে পেরেছেন।

কতজন মারা যান সেদিন? হিসাব করা কঠিন হওয়ার কথা নয়। কতজন সেদিন কাজ করছিলেন আর তার মধ্যে কতজন বেঁচে ছিলেন, এই হিসেব করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু কতজন কাজ করছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। শ্রমিকদের কোনো নিয়োগপত্র নেই। একমাত্র প্রমাণ পরিচয়পত্র। সেগুলো তো আবার শ্রমিকদের কাছেই থাকে।

কারখানাটি পরিদর্শনের সময় আনু মুহাম্মদ দেখতে পান চারতলায় কিছু মেশিন তখনও অক্ষত। আর মেশিনের সামনেই সারি সারি মেয়েদের ব্যাগ, টিফিন বক্স। নিচে ছড়ানো ছিটানো কমদামি স্যান্ডেল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যাগগুলি সব শূন্য। পরিচয়পত্র নেই। নেই টাকা, রুমাল বা আর কিছুও। মরণের মুখে দাঁড়িয়ে শ্রমিক মেয়েরা নিশ্চয়ই ব্যাগ থেকে জিনিস বের করে নেবেন না। পরে জনতা ব্যাগ থেকে জিনিস সরিয়েছে? রুমাল বা পরিচয়পত্র নিলে ব্যাগটি কেন ফেলে গেল তার কোনো উত্তর মেলে না। সঙ্গত কারণেই তাই আনু মুহাম্মদের অনুমান, পরিচয়পত্রগুলি উধাও করা হয়েছে প্রমাণ লোপাটের জন্য। গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। পরিচয়পত্র লোপাট হলে কে কাজ করত তার আর কোনো প্রমাণ নেই। ''কত মজুরি পাওনা ছিল, কত বকেয়া জমেছিল তাদের? সেগুলোর পরিশোধেরও কোন সম্ভাবনা নেই। অগ্নিকাণ্ডের জন্য মালিক পাবে বিমার অর্থ আর তার বেঁচে যাবে বহু শ্রমিকের পাওনা টাকা।... প্রমাণ না থাকলে ক্ষতিপূরণও দেবার দায় নেই।''

ভয়াবহ অবস্থা। তবে সেই ভয়াবহতার সম্পূর্ণ বিবরণ পেতে হলে শুধু মৃত্যুর হিসাব নয়, দেখতে হবে গারমেন্ট শ্রমিকরা কেমন করে বেঁচে থাকেন, সেটাও।

বাংলাদেশের গারমেন্ট শিল্প

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে গারমেন্ট শিল্প একটি প্রধান শিল্প হয়ে উঠেছে। টেক্সটাইল শিল্পের সঙ্গে একযোগে এটি বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের ৪৫ শতাংশ তৈরি করে আর জাতীয় উৎপাদনের ৫ শতাংশ আসে এই ক্ষেত্র থেকে। টেক্সটাইল শিল্প বাংলাদেশের একটি পুরনো শিল্প হলেও গারমেন্ট শিল্পটি নতুন একটি শিল্প। এর কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমত, এটি একটি রপ্তানি অভিমুখী শিল্প। এখন বাংলাদেশের মূল রপ্তানি পণ্য হলো গারমেন্ট। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে গারমেন্টের অংশ বছর বছর বাড়ছে। এখন এই পরিমাণটি মোটামুটি ৮০ শতাংশ।

গারমেন্ট শিল্পও, বলা বাহুল্য, দিন দিন বাড়ছে। ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে ২০০৪-০৪ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ২৭ শতাংশ! ১৯৮১ সালে যেখানে এই শিল্পের মোট উৎপাদন ছিল ৩৫ লক্ষ মার্কিন ডলার, ২০০৭ সালে দেখা যাচ্ছে মোট উৎপাদন ১০৭০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১২ সালে মোট গারমেন্ট রপ্তানি ছিল ১৮০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের। কিন্তু গারমেন্টের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তা মূলত আমদানি করতে হয়। আর তার জন্য রপ্তানিজাত আয়ের

অনেকটাই চলে যায়। গারমেন্টের দেশীয় বাজারও তেমন বাড়ছে না। এককথায়, এই শিল্পটি পুরোপুরি আমদানি-নির্ভর ও রপ্তানিমুখী।

কী ধরনের পোষাক তৈরি হয়, আর কারাই বা এর ক্রেতা? সুতি, রেয়ন, উল দিয়ে বিভিন্ন ধরনে শার্ট, টি-শার্ট, সোয়েটার ইত্যাদি। আমদানি করা কাপড়, সুতো, বোতাম ইত্যাদি দিয়ে অতি উচ্চমানের ও যথেষ্ট দামী এই পণ্য সম্ভার তৈরি হয় প্রায় সাড়ে চার হাজার বিভিন্ন মাপের কারখানায়। কারখানাগুলির বেশির ভাগই ঢাকা শহর ও তার আশপাশে। তবে অন্য জেলাগুলিতেও বেশ কিছু কারখানা আছে। এদের ক্রেতা হলো ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় নামী ব্র্যান্ড ও ওয়ালমার্টের মতো রিটেল চেইন। প্রকৃতপক্ষে, গারমেন্ট রপ্তানির ৯০ শতাংশই যায় ইউরোপ ও আমেরিকায়। আর সারা বিশ্বে গারমেন্ট রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান এখন দ্বিতীয়, চীনের পরই।

গার্মেন্ট শিল্পের আর একটি বিশেষত্ব এর শ্রমিককুল। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ, একটি মুসলিম দেশ, বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী এই শিল্পের ৩০ লক্ষ শ্রমিকের ৯০ শতাংশই নারীশ্রমিক। শুধু নারীশ্রমিক নয়, মূলত তরুণী শ্রমিক। বেশির ভাগেরই বয়স ২০-২৪ বছর।

এই শ্রমিকদের মজুরি এতই কম যে স্বয়ং পোপও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এটি মজুরি-শ্রমিকত্ব নয়, দাসত্ব। ২০১০ সালে শেষবার বৃদ্ধি পেয়ে নিম্নতম মজুরি এখন ৩০০০ টাকা। এই টাকা বাংলাদেশের টাকা। ভারতীয় রুপি-র হিসেবে এর পরিমাণ ২১০০ টাকা। জানা যাচ্ছে, ২০১০ সালে ৮০ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি পেয়ে গারমেন্ট শ্রমিকরা এই বেতনের অধিকারী হয়েছিলেন। তার আগে ২০০৬ সালে অনেক অগ্নিকাণ্ড ও ধসে পড়ে (এই লেখার প্রথমেই তার দু-একটির কথা বলা হয়েছে) মৃত্যুমিছিলের পর বিরাট প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছিল। "২১/২২ মে ২০০৬ ঢাকা শহর ও আশেপাশে শ্রমিকদের এক অভ্যুত্থান হলো। তারপরই কেবল মালিকেরা আলোচনায় বসলেন।" শ্রমিকদের দাবির অন্যতম ছিল ৩০০০ টাকা (বাংলাদেশী টাকা) মজুরি। কিন্তু সরকার ও মালিকপক্ষের সম্মতি ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হলো মাসে ১৬৬০ টাকা (বাংলাদেশী টাকা)। অথচ, অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ সেই সময়ে হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, যদি দারিদ্র্যসীমার আয় ধরা যায় তাহলেও চার জনের একটি পরিবারের জন্য কমপক্ষে ৪০০০ টাকা দরকার ছিল।

গারমেন্ট রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থা দ্বিতীয়
আর গারমেন্ট শ্রমিকদের বেতন পৃথিবীর সর্বনিম্ন

দেশ	*প্রতি ঘন্টায় মজুরি*		*পোষাক রপ্তানিতে*
	ডলারে	*টাকায়**	*অবস্থান*
চীন	**০.৯৩**	**৭৪.৮০**	**প্রথম**
মালয়েশিয়া	০.৭৩	৫৮.৪০	
থাইল্যান্ড	০.৫৬	৪৪.৮০	
ভারত	০.৫৬	৪৪.৮০	
ভিয়েতনাম	০.৫২	৪১.৬০	
শ্রীলংকা	০.৪৬	৩৬.৮০	
পাকিস্তান	০.৩৭	২৯.৬০	
ইন্দোনেশিয়া	০.৩৫	২৮.৫০	
বাংলাদেশ	**০.২১**	**১৬.৮০**	**দ্বিতীয়**

* বাংলাদেশী টাকা

এখন, আবার এক বিরাট মৃত্যুমিছিল আর শ্রমিক বিক্ষোভের পর বাংলাদেশ সরকার নতুন বেতন কমিশন ঘোষণা করেছেন। তাতে সামান্য বেতন বাড়বে আশা করা যায়। সারাদিন পরিশ্রম করে দারিদ্র্যরেখার নিচের জীবন যাপনের জন্যও কত রক্ত দিতে হবে শ্রমিকদের?

মজুরি এত কম কেন? এত নারীশ্রমিক কেন? দুটো প্রশ্ন পরস্পরের উত্তর। নারীশ্রমিক রাখাই হয়েছে যাতে মজুরি কম রাখা যায়, ইউনিয়নের 'ঝামেলা' না থাকে। আর এই কাজে গারমেন্ট শিল্পের মালিকরা সফল। এই কম মজুরির জন্যই তো গারমেন্ট রপ্তানিতে এত বাড়বাড়ন্ত। কাঁচামাল আমদানি করেও, কাঁচামালের দেশে ও বাজারজাতকরণের দেশে মুনাফার সিংহভাগ দিয়েও গারমেন্ট মালিকদের বিএমডবলিউ গাড়ি চড়ার স্বপ্ন সফল হয় তো এই শ্রমিকদের ঘামে, ও রক্তে।

গারমেন্ট শিল্পে মালিকদের খুব শক্তিশালী সংগঠন থাকলেও ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে নেই। গারমেন্ট শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দেওয়া হয় না। ক্ষোভ আছে, কিন্তু নেতৃত্ব নেই।

ইউনিয়ন তো ছেড়েই দিন, নিয়োগপত্রও নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা হাজিরা কার্ড। যার কোনো আইনি গুরুত্ব নেই। কারখানায় আগুন লাগলে সেই কার্ড সরানোর কথা তো আগেই বলেছি। কারণ এই সামান্য বেতন (ও ওভারটাইম) প্রায়ই বকেয়া থাকে। ২০০৬ সালে আনু মুহাম্মদ হিসেব করেছেন, মজুরি আর ওভারটাইম নিয়ে বকেয়া তখন কয়েক হাজার কোটি টাকা। চাকরির নিশ্চয়তা নেই। কামাই করলে, বিয়ে করলে বা বাচ্চা হলে চাকরি যেতে পারে। কাজের সময়ের কোনো ঠিক নেই। ৮ ঘন্টার শ্রমদিবস এখনও একটা দাবি মাত্র। ১০-১২ ঘন্টা স্বাভাবিক ঘটনা। তেমন কাজের চাপ থাকলে এমনকি ২৪ ঘন্টা টানা কাজও করতে হয়।

শ্রমিকদের মারধোর, চোর অপবাদ দিয়ে এমনকি পিটিয়ে মারা— এগুলোও স্বাভাবিক ঘটনা বাংলাদেশের গারমেন্ট শিল্পে। নারী শ্রমিক হিসাবে আর একটা বাড়তি পাওনা, যৌন অত্যাচার। আনু মুহাম্মদ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। সারা রাত বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করার পর একটি মেয়ে রাত

তিনটের সময় মালিক কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। তার পর মালিক তো ঘুমোতে চলে গেল। মেয়েটি ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে বসে থাকল। সকাল হলো। মেয়েটি বাড়ি যাবে কীভাবে? গার্ড জানালো, না, গারমেন্টের কোনো কাপড় দেওয়া যাবে না। শেষে একজনের কাছ থেকে একটা বস্ত্রাংশ ধার পাওয়া গেল। ধর্ষিতা মেয়েটি দুদিন কাজে এলো না। তৃতীয় দিন এসে জানতে পারল, তার কাজ নেই, কারণ সে দুদিন আসে নি।

শ্রমিকদের এই রক্ত, ঘাম, ইজ্জত থেকে তৈরি হয় মুনাফা, বৈভব। শুধু গারমেন্ট শ্রমিকদের রক্ত-ঘাম কেন, বাংলাদেশের মানুষও গারমেন্ট মালিকদের অনেক ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। শুল্কমুক্ত আমদানি-রপ্তানি, ঋণ-সুবিধা, তাছাড়া ঝড়, বন্যা ইত্যাদি হলে ক্ষতিপূরণ।

অনেকে বলছেন, কম মজুরি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কম মজুরির জন্যই বাংলাদেশ গারমেন্ট রপ্তানির এই সুবিধা পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমে বলা দরকার বাংলাদেশে গারমেন্ট শিল্পে বিদেশি পুঁজি বিশেষ নেই। স্থানীয় মাঝারি পুঁজিপতিরা এই কারখানাগুলির মালিক। কিন্তু এগুলি আসলে বিশ্বজোড়া পুঁজির জালের একটি অংশ।

একটা উদাহরণ দিই। সুইডেন প্রবাসী মাহমুদ আলী কয়েক বছর আগে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া 'কমদামি' সোয়েটার সুইডেনের মানুষ কেনে অন্তত ১৫০ সুইডিশ ক্রাউনে। এর থেকে ভ্যাট হিসেবে সুইডেনের সরকারের আয় হয় ৩৭ ক্রাউন। সুইডিস ব্যবসায়ীর আয় হয় ৭৩ ক্রাউন। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী পান ৪০ ক্রাউন। আর বাংলাদেশের গারমেন্ট শ্রমিক পান আধ ক্রাউনেরও কম।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

এখন অবশ্য এত মৃত্যু ও সে নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে যাওয়ার পর, বাংলাদেশ সরকার, আগেই বলেছি, বেতন বাড়াবার জন্য একটি কমিশন গঠন করেছেন। শ্রম বিষয়ক একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে তারা জানিয়েছেন, আগের বছরের নিট মুনাফার ৫ শতাংশ টাকা এখন থেকে শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। ইউনিয়নের ওপর কার্যত যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাও তুলে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই সেখানে তা গঠিত হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক একটি কমিটি ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করবে। তারা যৌথ দরকষাকষিতে তারা অংশ নিতে পারবে। ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের অংশগ্রহণের একটা ধারাও রাখা হয়েছে এই সংশোধনীতে।

তথ্যসূত্র

'প্রাণের বিনিময়ে মুনাফা', শামীম ইমাম, আহ্বায়ক, জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন, ৭ মে ২০১৩

ফুলবাড়ী কানসান গার্মেন্টস ২০০৬, আনু মুহাম্মদ, ঢাকা, ২০০৭

সাম্প্রতিক ও পুরনো নানা পত্রপত্রিকা, গবেষণাপত্র

এখন তোমার পা

আলী রীয়াজ (বাংলাদেশ)

তোমার কঙ্কনের ধ্বনি বেজেছে মায়ের আঙ্গিনায়, তোমার সংসারে
তোমার উর্ধ্বমুখী হাত উঠেছে প্রার্থনায়
সে গতকাল ছিলো

তখন তোমার অশ্রু ও ঘামকে আমরা বিক্রি করেছি সস্তা দামে

তুমি আমাদের কাছে বড় বেশি প্রয়োজনীয় ছিলে
ডলারের হিসাবে প্রয়োজনীয় ছিলে,
বিশ্ব-বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় ছিলে
সরকারি পরিসংখ্যানে প্রয়োজনীয় ছিলে
বাংলাদেশ বলতে আমি তোমার মুখ, তোমার ব্যস্ততাকে
নিপাট নিভাঁজ করে, উজ্জ্বল সেমিনার কক্ষে
সযত্নে দেখিয়েছি একাধিক বার

তোমার পায়ের দিকে চোখ মেলে তাকানো হয়নি
যে পা তোমাকে এনেছে গ্রাম থেকে প্রাণহীন ইটের নগরে
এনেছে কারখানায়, সুউচ্চ ভবনে

সেটা গতকাল ছিল
তখন তোমার অশ্রু ও ঘামকে আমরা বিক্রি করেছি সস্তা দামে

তোমার চোখের দিকে তাকানো হয়নি
তোমার কণ্ঠস্বর শোনা হয়নি
আমাদের কখনো হয়নি দেখা
কেননা আমরা ব্যস্ত ছিলাম—

সেটা গতকাল ছিল
তখন তোমার অশ্রু ও ঘামকে বিক্রি করেছি সস্তা দামে

আজ তোমার উত্থিত পা, তোমার নিশ্চল পা
তোমার পদাঘাত বলেছে আমাকে
তুমি পরিসংখ্যান নও, তুমি সস্তা শ্রম নও,
তুমি কেবল অশ্রু ও ঘাম নও

গতকাল তোমার কঙ্কনের ধ্বনি বেজেছে মায়ের আঙ্গিনায়,
তোমার সংসারে

তোমার বোনেরা অঙ্গার হয়েছে
চাপা পড়েছে ভবনের নিচে
তোমার বোনেরা অ-শনাক্ত লাশ হয়ে আছে শুয়ে আছে অচেনা কবরে

আমাকে, আমাদেরকে আর কতবার বলতে হবে—
তুমি পরিসংখ্যান নও, তুমি সস্তা শ্রম নও, তুমি কেবল অশ্রু ও ঘাম নও
গতকাল তোমার কঙ্কনের ধ্বনি বেজেছে মায়ের আঙ্গিনায়,
তোমার সংসারে
আগামীকাল তোমার কঙ্কনের ধ্বনি বাজবেনা মায়ের আঙ্গিনায়,
তোমার সংসারে

এখন তোমার পা উদ্যত বাংলাদেশের দিকে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন

সমকালীন প্রেক্ষাপট, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

ধূর্জটি প্রসাদ বক্সী

১৬০ বছর পূর্বে ভারতের আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম। শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম উপাদান সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন। আন্দোলনের বয়সও দেখতে দেখতে ১০০ ছুঁই ছুঁই। ১৯০৮ সালে গঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মুম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা যে ঐতিহাসিক হরতাল সংগঠিত করেছিলেন এবং যা ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের গণবিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল— তাকে স্বয়ং লেনিন ভারতের শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক জাগরণ রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে শ্রমিক আন্দোলন নিজেদের মজুরি-বোনাস বা সম্মানের জন্য সংগ্রামের সীমা ছাড়িয়ে বারবার রাজনৈতিক উত্থানের নতুন নতুন মাইল-ফলক তৈরি করেছেন। শোলাপুর কমিউন, নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে হরতাল, আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের মুক্তির জন্য আন্দোলন ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বিংশ শতাব্দীর ৫০ ও ৬০-এর দশকে শ্রমিকশ্রেণী আরও বড় আকারে সংগঠিত হয়েছেন এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করার জন্য সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের তীব্র সংগ্রাম এবং ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। একই সাথে কংগ্রেস বিরোধী গণ-অভিযানেও শ্রমিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সমর্থনে দুর্গাপুরের ইস্পাত শ্রমিকদের ১৩ দিনের হরতাল ও পুলিশি দমনের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একই সাথে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে একের পর এক বিভাজন, সংকীর্ণ সেক্টর, বিভাগ বা ক্যাডার মানসিকতা, অর্থনীতিবাদ, ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের একটি অংশের ম্যানেজমেন্ট তথা সরকারি তন্ত্রে অঙ্গীভূত হয়ে পড়া— এই নেতিবাচক প্রবণতাগুলো শ্রমিক আন্দোলনকে বহু দিক থেকে প্রভাবিত করেছে।

সব মিলিয়ে সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে উল্লিখিত নেতিবাচক প্রবণতা তথা দুর্বলতাগুলো কখনই শেষ করতে পারেনি, বরং পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রমিক আন্দোলনের এই জীবন্ত ও বিকাশমান ধারা বারবার নিজেকে পুনর্জীবিত করেছে— এগিয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই হতে পারে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গতিসূত্র তথা তৎকালীন স্বরূপকে আয়ত্ত করার চাবিকাঠি।

সমকালীন প্রেক্ষাপট

আর্থিক উদারিকরণ তথা ভুবনীকরণের নীতির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এবং তার সামগ্রিক তথা নির্দিষ্ট প্রভাব ও ফলাফলের প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশমান প্রত্যুত্তরই সমকালীন প্রেক্ষাপটের নির্ণায়ক উপাদান। শেষবিচারে পুঁজির কর্পোরেটিকরণ তথা ছোট বা সামাজিক পুঁজি সহ সমগ্র পুঁজির ওপর দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম হয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তাসমূহ ক্রমাগত সঙ্কুচিত করা হয়েছে, এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

বহুসংখ্যক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) গঠন কার্যত 'এক দেশ দুই শ্রমনীতি'র প্রয়োগশালা; এর সাথে হরিয়ানার গুরগাঁও-মানেসার, উত্তরাখন্ডের রুদ্রপুর এবং চেন্নাইয়ের শ্রীপেরামবুদুর বেল্টকে "ট্রেড ইউনিয়ন বর্জিত" নতুন শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কর্পোরেট তথা বৃহৎ পুঁজির এই আধিপত্য বিস্তারের অভিযানে ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্য ভারতীয় শাসকশ্রেণী "আর্থিক বৃদ্ধির" এক কল্পকথা তৈরি করেছে। এই কল্পকথার ফানুসকে চুপসে দেওয়ার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

- '৮০-র দশকে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে নেট মূল্য সৃষ্টির তুলনায় মজুরির অংশ ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। ৯০-এর দশকে এটা নেমে দাঁড়িয়েছিল ২০ শতাংশে এবং ২০০৮-০৯ পর্যায়ে এটা দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশ।
- অন্যদিকে ম্যানেজমেন্টের উপরতলার আয় অস্বাভাবিক-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। '৯০-এর দশকে গড়পড়তা শ্রমিকের মজুরির তুলনায় ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের বেতন ছিল ২ গুণ। ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৩ গুণ বেশি। বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানির সিইও-দের বেতন তাক লাগিয়ে দেয়। ২০১১-১২ পর্যায়ে নবীন জিন্দলের বার্ষিক বেতন ৭৩.৪২ কোটি টাকা, সান নেটওয়ার্কের কালানিধি ও কাবেরী কালানিধির প্রত্যেকের বেতন ৫৭.১ কোটি টাকা, হিরো মোটর্স-এর পবন মুনজল ও ব্রিজমোহন মুনজল প্রত্যেকের বেতন ৩৪.৫৫ কোটি টাকা, মাদ্রাজ সিমেন্টের পি আর রাজার বেতন ২৯.৩৪ কোটি টাকা এবং মারুতি সুজুকির সিনজো নাগাসাকির বেতন ২৮.১২ কোটি টাকা।

- ১৯৭৩-১৯৮৩ পর্যায়ে জিডিপি বৃদ্ধির গড়পড়তা হার ছিল বার্ষিক ৪.৭ শতাংশ এবং কর্ম সৃষ্টির হার ছিল ২.৪ শতাংশ। ১৯৮৩-১৯৯৩ পর্যায়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫ শতাংশ এবং কর্ম সৃষ্টির হার দাঁড়ায় ২ শতাংশ। ১৯৯৩-২০০৩ পর্যায়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৩ শতাংশ এবং কর্ম সৃষ্টির হার দাঁড়ায় ১.৮ শতাংশ। ২০০৪-২০০৯ পর্যায়ে এটা পৌঁছায় যথাক্রমে ৯ শতাংশ এবং ০.২২ শতাংশে।
- এছাড়া পূর্ণ সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত, আধা-সরকারি এবং কর্পোরেট সহ সব ধরনের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়েছে বল্গাহীন ঠিকাদারীকরণ ও অস্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া। সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে স্থায়ী বনাম ঠিকাদার বা অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারিদের অনুপাত ৬০ : ৪০ বা ৫০: ৫০ হলেও নতুন করে গড়ে ওঠা কর্পোরেট, জয়েন্ট ভেঞ্চার বা এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় এই অনুপাত ৩০ : ৭০ থেকে ১০: ৯০ পর্যন্ত। সাধারণ ঘটনা হচ্ছে নতুন নিয়োগের সিংহভাগই হচ্ছে ঠিকাদার বা অস্থয়ী শ্রমিক। এই প্রক্রিয়ার একমাত্র তাৎপর্য হচ্ছে ব্যাপক হারে বেতন হ্রাস যা বৃহৎ পুঁজির মুনাফা বৃদ্ধির নামান্তর।
- এই পাহাড়-প্রমাণ মুনাফা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক কর ছাড়ের অবদানও কম নয়। গত ৫ বছরে এই কর্পোরেটদের কর ছাড়ের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি টাকা। এটা কি প্রকাশ্যে ও বৈধভাবে সংঘটিত এক আর্থিক কেলেঙ্কারি বা স্ক্যাম নয়! এছাড়া অজস্র অবৈধ উপায়ে কালো টাকার সঞ্চয়, বিশেষ করে বিদেশি ব্যাঙ্কে কত পরিমাণে জমা হচ্ছে, এটা তো হিসাব করা মুসকিল।

সব মিলিয়ে সমকালীন প্রেক্ষাপটের গতিসূত্র নিম্নলিখিত স্ববিরোধিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়—

ক) একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিসম্মত ঝকঝকে কর্পোরেট পুঁজি বনাম উনবিংশ শতাব্দীর বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাজের শর্তাবলী।

খ) সমগ্র শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে (এমনকি উৎপাদন তথা কার্যক্ষেত্রের মুখ্য ধারায়) ক্রমবর্ধমান ঠিকাদারিকরণ ও অস্থায়ীকরণ বনাম এই নতুন প্রজন্মের অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে নিহিত সুপ্ত নতুন আঘাত হানার ক্ষমতা।

গ) শ্রম-আইনের সংস্কারের স্থগিতকরণ তথা অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক স্কিমের ঢক্কানিনাদ বনাম বাস্তব জীবনে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য শ্রমিক-অধিকারগুলি হননের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা।

বৃহৎ পুঁজির সর্বাত্মক আক্রমণ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যুত্তর

১) আর্থিক সংস্কারের ফলশ্রুতিতে নিচুতলার উৎপাদন বা কর্মক্ষেত্রগুলোতে বিভিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ছোট-বড় অজস্র প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, এমনকি আচমকা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা এক সাধারণ প্রবণতা। সাধারণভাবে কর্ম-সংকোচনজাত কাজের চাপ বৃদ্ধি, নিয়মিত বেতন না দেওয়া, দুর্ঘটনার পর ম্যানেজমেন্টের উপেক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিক্ষোভ ফেটে পড়তে দেখা যায়। সুবিধাবাদী বামপন্থী ধারা সহ মুখ্য ধারার ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব নিচুতলার এই ধরনের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের প্রতি সাধারণভাবে উদাসীন মনোভাব প্রদর্শন করেন, খুব চাপে পড়লে তাদের হস্তক্ষেপ মূলত গোঁজামিলের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং লক-আউট বা ক্লোজারের আতঙ্ক ছড়িয়ে এক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তথা আত্মসমর্পণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। নিচুতলার এই স্বল্প-প্রচারিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। এই ধরনের নীচুতলার প্রতিরোধের একটি দৃষ্টান্ত বৃহত্তর শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করতে পারে।

২) গত দেড় দশক ধরে আর্থিক উদারিকরণের প্রভাব-গুলোর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলোর দেশব্যাপী সংযুক্ত অভিযান এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমিকদের চাপে এমনকি আইএনটিইউসি বা বিএমএস-এর মতো প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোও এই সংযুক্ত অভিযানে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বা সেক্টর স্তরে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একজোট হওয়া আজকের স্তরের শ্রমিক আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ব্যাপক ঐক্যের এই প্রবণতাকে অবশ্যই এক অনুকূল মঞ্চ রূপে আমাদের পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে যাতে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করে উদারিকরণ তথা বেসরকারিকরণের নীতির পরিবর্তনকে নিশ্চিত করা যায়। গত ২০-২১ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘট তথা সাধারণ হরতালের সফলতা এবং লাল ঝান্ডা হাতে ব্যাপক শ্রমিকের সক্রিয় জঙ্গি অংশগ্রহণ সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

৩) ২০০৭-২০১২ পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে অটোমোবাইল শিল্প (সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ উৎপাদন ইউনিট সহ) শ্রেণীসংগ্রামের সবচেয়ে গতিশীল ঝটিকা-কেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দিল্লী সংলগ্ন গুরগাঁও-মানেসর-বাওয়াল অঞ্চলটি ৬০ শতাংশ অটো উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে রূপ পেয়েছে, কিন্তু সেখানে ১০ লক্ষ শ্রমিকের ৮০ শতাংশই ঠিকা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে। বহু ছোট-বড় প্রতিবাদ বা আন্দোলন এই অঞ্চলে সংগঠিত হলেও বহু ক্ষেত্রেই মাফিয়া-সামন্তশক্তি(খাপ-পঞ্চায়েত)-পুলিশ-কর্পোরেটের অশুভ আঁতাত ব্যাপক দমনের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। তথাপি এই ধারা অক্ষুন্ন থেকেছে। সামগ্রিকভাবে ব্যাপক শ্রমিকের সমর্থনপুষ্ট প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের মান্যতা এবং ঠিকা শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ— দুটি বুনিয়াদি আশু দাবি হিসাবে উঠে এসেছে।

অটোমোবাইল শিল্পে সাম্প্রতিক দুটি আন্দোলন দৃষ্টান্তযোগ্যঃ একটি মানেসরের মারুতি এবং অপরটি তামিলনাড়ুর কোয়াম্বাটুরে অবস্থিত প্রিকল শ্রমিকদের আন্দোলন। দুটি আন্দোলনই ঠিকা, অ্যাপ্রেন্টিস বা স্থায়ী সহ সমগ্র শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করেই রূপ পেয়েছিল। উভয় সংগ্রামই বিভিন্ন রূপকে সমন্বয় করে এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে আসার আঁকাবাঁকা পথে বিকশিত হয়েছে। ছাঁটাই-লকআউট থেকে শুরু করে মাফিয়াদের আস্ফালন বা পুলিশি সন্ত্রাসের মুখোমুখি হতে হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই সংগ্রামের জটিল মোড়ে শ্রমিকদের গণক্ষোভের বিস্ফোরণের শিকার হন ম্যানেজমেন্টের একজন কর্তাব্যক্তি।

মারুতির ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট বন্ধ করে ব্যাপক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন পরে ৫০০-র বেশি শ্রমিককে ছাঁটাই করে প্ল্যান্ট খোলা হয় ও ধীরে ধীরে উৎপাদন শুরু হয়। এই বিরাট ধাক্কার সামনে মারুতি শ্রমিক আন্দোলন পিছু হঠলেও শ্রমিকদের অগ্রণী বাহিনী এখনও হতোদ্যম নয়। এই আন্দোলনের সংহতিতে বিভিন্ন শ্রমিক ও দিল্লীর ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। পরিস্থিতিটা ঝড়ের পূর্বের দমবন্ধ নীরবতার মতো। আগামী দিনের কোনো একটা মোড়ে মারুতি শ্রমিকদের বিস্ফোরণ অনিবার্য।

অন্যদিকে প্রিকল শ্রমিকরা সমস্ত জটিলতা অতিক্রম করে মূলত সংগ্রামী মেজাজকে অক্ষুণ্ণ রেখে ও বিভিন্ন রূপের পরিপক্ক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক জয় হাসিল করেছেন। শেষপর্যন্ত এআইসিসিটিইউ পরিচালিত প্রিকল শ্রমিক ইউনিয়নের মান্যতা হাসিল হয় এবং এই ইউনিয়ন নতুন চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

অটোমোবাইল শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বরূপ :

- ২০০৪-০৫ সালে সব ধরনের ভেহিকল উৎপাদন ছিল ৮৫ লক্ষ;
- ২০১১-১২ সালে এই উৎপাদন পৌঁছে যায় ২ কোটি ৪ লক্ষে;
- ২০০১-২০১০ পর্যায়ে অটোমোবাইল শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে ১৮.৮ শতাংশ;
- ২০০১ সালে একজন অটোমোবাইল শ্রমিকের ৮ ঘণ্টা শ্রম সময়ের ২ ঘণ্টা ১২ মিনিট ব্যয় হত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, বাকি ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ব্যয় হত পুঁজির উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য। ২০১০ সালে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট এবং ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট।

৪) বৃহৎ শিল্প ও পরিষেবার ঠিকা বা অস্থায়ী মজদুর, আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী (মাইগ্রেন্ট) শ্রমিক, বিরাট আকারে সম্প্রসারিত নির্মাণ ক্ষেত্রের অসংগঠিত শ্রমিক এবং অসংগঠিত সেক্টরে ক্রমবর্ধমান মহিলা শ্রমিক (সস্তা শ্রমের বিশাল ভাণ্ডার রূপে)— এই নতুন প্রজন্মের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠিত হওয়া এবং তাদের মজুরি, সম্মান, সামাজিক নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ, আন্দোলন ও প্রতিরোধের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তামিলনাড়ুর নেভেলিতে এনএলসি-র কয়েক হাজার ঠিকা মজদুর পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত ২০১২ সালে ৪৪ দিনে লাগাতার ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বেতন সমতা ও নিয়মিতকরণ— এই দুটি মৌলিক দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন।

- ২০০০ থেকে ২০০৯ এই পর্যায়ে ফ্যাক্টরি সেক্টরের সমগ্র শ্রম-শক্তির মধ্যে ঠিকা মজদুরদের অনুপাত ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ শতাংশ।
- অন্যদিকে সেলের একটি মামলায় ২০০১ সালে সুপ্রিম কোর্ট ঠিকা মজদুর (নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের মর্মবস্তুকে খারিজ করে রায় দেয় যে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর ঠিকা মজদুরদের নিয়মিতকরণ অনিবার্য নয়।

৫) শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্রে পার্শ্ব বা সর্বস্তরের ঠিকা শিক্ষক এবং 'সাম্মানিক'-ভিত্তিক আশা বা মিড-ডে মিল কর্মচারীদের একটা বিরাট বাহিনী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নতুন সংযোজন। শিক্ষিত ও যুব প্রজন্মর পৃষ্ঠভূমি থেকে এরা কর্মচারী বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

এদের মধ্যে রয়েছে সংগঠিত হওয়ার বিরাট আকাঙ্ক্ষা এবং ন্যায্য বেতন ও চাকরির নিরাপত্তার প্রশ্নে এরা আন্দোলিত। এই অংশটি বিশেষ করে পার্শ্ব-শিক্ষকরা বড় সংখ্যায় সমাবেশিত হয়ে বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। প্রায়শই তাদের আন্দোলনকে পুলিশের নির্মম দমনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রায় সমস্ত রাজ্যেই এই ধারাটি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। একই পথে 'আশা' কর্মীরাও ধাপে ধাপে এগুচ্ছেন। আগামীদিনে নতুন প্রজন্মের মহিলা শ্রমিক-কর্মচারী জাগরণে এই অংশটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আজকের চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রথমত, আর্থিক উদারিকরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের যে ধারাটি গড়ে উঠেছে তার দুটি মুখ্য দুর্বলতা রয়েছে। একদিকে এই ঐক্য প্রয়াসকে একদম নিচুতলায় মজবুত করতে না পারা, অন্যদিকে শিল্প বা সেক্টরভিত্তিক নির্দিষ্ট কোনো কার্যকর আন্দোলনের পক্ষে ঐক্য-মঞ্চকে নামাতে না পারা। বিপ্লবী বামপন্থী ধারার ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট বা শপ স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক রং নিরপেক্ষভাবে সংগ্রামী ঐক্য-মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে (বিশেষ করে নির্দিষ্ট ইস্যুর ভিত্তিতে) এবং ছোট শিল্প বা অসংগঠিত সেক্টরের ক্ষেত্রে এলাকা-ভিত্তিক এই ধরনের মঞ্চ গড়ার প্রয়াস নিতে হবে। এছাড়া ব্যাপক শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি চেতনাকে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বা শিল্প কেন্দ্রে ছোট ছোট সংহতি আন্দোলনের ধারাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিশাল অসংগঠিত শ্রমিকবাহিনীকে সংগঠিত করার জন্য সমগ্র দৃষ্টি ও সংগঠিত প্রয়াস এবং সংগঠিত ও

অসংগঠিত শ্রমিকদের মেলবন্ধনকে মজবুত করা (বিশেষ করে সংগঠিত সেক্টরে স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে এক স্বাভাবিক ঐক্য গড়ে তোলা)। অনুশীলনলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, এই প্রশ্নে অসংগঠিত সেক্টরের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে সংগঠিত করার জন্য জাতীয় স্তরে বা রাজ্য স্তরে, নিদেনপক্ষে জেলা স্তরে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার ও তাদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে ছোট ছোট সংগ্রামের একটি নিয়মিত ধারা গড়ে তুলতে হবে (যার মধ্যে দু-একটি নির্ণায়ক জয় হাসিল করতে সচেষ্ট হতে হবে)। বড় শিল্পের ঠিকা শ্রমিকদের বড় আকারে সংগঠিত করার জন্য কারখানা সংলগ্ন জমায়েত কেন্দ্রে আমাদের সক্রিয় উপস্থিতির সাথে সাথে তাদের বাসস্থানে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিযান চালাতে হবে। ঠিকা শ্রমিকদের সাথে স্থায়ী শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা কাটানোর জন্য মূলত স্থায়ী শ্রমিকদের অগ্রণী অংশকে উদ্যোগী করে তুলতে হবে এবং ঠিকা শ্রমিকদের ওপর যে কোনোও অবিচার বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠানো এবং তাদের যে কোনো ধরনের আন্দোলন বা প্রতিবাদকে সমর্থন করার এক সক্রিয় কর্মধারা গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয়ত, এই মুহূর্তে শ্রেণীসংগ্রামের ঝটিকা কেন্দ্র রূপে অটোমেবাইল শিল্প নির্মাণ, কয়লা, প্যারা বা ঠিকা শ্রমিক ও আশা-অঙ্গনবাড়ি-মিড-ডে-মিলের মতো সেক্টরগুলোতে বিপ্লবী বামপন্থার প্রভাব বৃদ্ধি ও ট্রেড ইউনিয়ন জাল বিস্তার করা। এই প্রশ্নে পরিকল্পিত ও সৃজনশীল উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই।

চতুর্থত, রেল, ব্যাঙ্ক, টেলিকম, বিমা, পোস্টাল, স্বাস্থ্য, শিক্ষক সহ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ইত্যাদির প্রতিষ্ঠিত ফেডারেশনগুলোর মধ্যে এখনও ব্যাপক অর্থে বামপন্থী ও সোশ্যালিস্ট ধারার আধিপত্য রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠিত কাঠামোগুলোর নেতৃত্বের মধ্যে এক 'জেনারেশন গ্যাপ' লক্ষ্য করা যায়। রেল ছাড়া বাকি সেক্টরগুলোতে নিয়মিত সর্বভারতীয় আন্দোলনের ধারাটি যথেষ্ট শক্তিশালী। বিপ্লবী বামপন্থীদের তরফে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে এক সক্রিয় হস্তক্ষেপ আজ সময়ের দাবি, যাতে এখানে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে এক নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করা যায়।

পঞ্চমত, আর্থিক উদারিকরণের প্রত্যুত্তরে সাধারণ প্রতিষ্ঠিত দাবিগুলোর সাথে সাথে বাস্তব আন্দোলন থেকে উঠে আসা নিম্নলিখিত দাবিগুলোকে এই মুহূর্তের শ্রমিকশ্রেণীর চার্টার রূপে জনপ্রিয় করে তোলা:

ক) সমগ্র খনিজ, জঙ্গল ও জল সম্পদের সম্পূর্ণ জাতীয়করণ;

খ) সমস্ত স্তরের শিল্প ও পরিষেবার ব্যাপক শ্রমিক সমর্থনপুষ্ট প্রকৃত ইউনিয়নের মান্যতা সুনিশ্চিত করতে এক সমান আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা;

গ) ঠিকা মজদুরদের নিয়মিতকরণ তথা পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা, পরিচিতি ও অধিকার সুনিশ্চিত করতে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন;

ঘ) সাচার কমিশনের আদলে দেশের মহিলা শ্রমিকদের সম্পর্কে এক পূর্ণাঙ্গ সার্ভে করার জন্য এক শক্তিশালী কমিশন গঠন;

ঙ) 'এক দেশ, দুই শ্রমনীতি' খারিজ করে সর্বাত্মক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং সমান ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করা।

উপসংহারের পরিবর্তে

আজ আমাদের দেশে পার্টি নিরপেক্ষভাবে শাসকশ্রেণী আর্থিক উদারিকরণের রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং এই প্রশ্নে এখনও তাদের কোনো পুনর্বিচারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গত পরিণতি রূপে কর্পোরেট পুঁজি আজ জমি, জঙ্গল, জল ও খনিজ সম্পদের ওপর তাদের দখলদারির মধ্যে সীমিত না থেকে আমাদের দেশের রাজনীতির ওপরও তাদের প্রকাশ্য আধিপত্য কায়েম করেছে। শ্রমিক বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই কর্পোরেট-ভিত্তিক রাজনৈতিক অর্থনীতির কার্যকর প্রত্যুত্তর হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি রূপে উত্থান, যা শুধু কেন্দ্রীয় বা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার স্পর্ধা দেখায় না, বরং শাসকশ্রেণীর কর্পোরেটমুখী নীতি পরিবর্তনের জন্য সরকার পরিবর্তনের রাজনৈতিক অভিযানেও সক্রিয় হস্তক্ষেপ করার জন্য দৃঢ়-সংকল্প। অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর উত্থানকে একই নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত খেতমজুর, অন্যান্য গ্রামীণ শ্রমিক, ছোট কৃষক তথা আদিবাসী শক্তির সাথে ঐক্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর এহেন উত্থানের গঠনপর্বে যে তিনটি উপাদানকে একীকৃত করতে হবে তা হলো : বহুমুখী উদ্যোগের ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়নকে আরও শক্তিশালী করা, শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন গণদাবির ভিত্তিতে নিয়মিত গণ-রাজনৈতিক অভিযান পরিচালিত করা এবং অগ্রণী শ্রমিকদের বিপ্লবী বামপন্থী মতাদর্শের ভিত্তিতে সংহত করা।

আর এই ত্রিমুখী উদ্যোগ সমন্বয় করার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাগার হয়ে উঠতে পারে দেশব্যাপী কতগুলো 'এলাকা' যা বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ অধ্যুষিত। এই এলাকাগুলোই ধাপে ধাপে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী এলাকায় রূপান্তরিত করতে হবে।

এই ধরনের এলাকাগুলো গড়ে তোলার কোনো ফর্মুলা নেই, আছে কিছু প্রারম্ভিক বিন্দু। যেমন মতাদর্শগত দৃঢ়তা ও কর্পোরেট হামলার বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক স্পষ্টতা তথা স্পষ্ট সীমারেখা, সাংগঠনিক দক্ষতার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন, বিভিন্ন রূপের ব্যবহার ও সমন্বয়ের পরিপক্কতা এবং সর্বোপরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর দুর্বার সাহস। আত্মগত পরিস্থিতি থেকে শুরু না করে বস্তুগত পরিস্থিতির সাম্প্রতিক গতিকে আয়ত্ত করে ও সক্রিয় হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়েই আত্মগত শক্তিকে মজবুত করে তোলা যায়— এই হোক আমাদের মন্ত্র।

শ্রম ও শ্রমিক

ভারতের চলমান শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

কুশল দেবনাথ

গত ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি কয়েকটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে নির্দিষ্টি কিছু দাবির ভিত্তিতে গোটা দেশে শিল্প ধর্মঘট পালিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মতো কোন কোন রাজ্যে ১ দিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাকও দেওয়া হয়। এই ধর্মঘটে দেশের প্রায় সব কটি কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়ন অংশগ্রহণ করেছিল। এআইসিসিটিইউ থেকে আইএনটিইউসি, এমন কি বিএমএস পর্য্যন্ত। বহু আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছিল। কেউ কেউ সমালোচনা মূলক সমর্থন করেছে। নয়া উদারনীতি জমানায় পুঁজি ও রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর উপর ভয়ংকর হামলার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ এই ধর্মঘটকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নয়া জাগরণ হিসাবে উল্লেখ করছেন এবং পুঁজির নিষ্ঠুর আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধের রাস্তা হিসাবে এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে চিহ্নিত করছেন। এটা সত্য, যে দাবিগুলিকে সামনে রেখে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল তা এদেশের বহু শ্রমিকের বাস্তব দাবি। আবার এটাও ঘটনা, এ রাজ্যে তুলনামূলকভাবে কম হলেও অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের নড়াচড়া লক্ষ করা গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে দলগুলি এদেশের নয়া উদারবাদী পলিসিকে কার্যকর করছে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে, আবার তাদের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি নয়া উদারনীতি হামলার বিরুদ্ধে এই ধর্মঘটের প্রধান উদ্যোক্তা কী করে হয়? বিষয়টা কি এই রকম যে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা একে ধরনের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন? আজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় স্তরে বাস্তবায়িত করছে কংগ্রেস ও বিজেপি। আবার কেন্দ্রীয় ভাবনা নিয়ে রাজ্য ভিত্তিক স্তরে এক বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে সিপিআই(এম)। অপরদিকে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটের প্রধান শক্তিই হলো আইএনটিইউসি, বিএমএস এবং সিটু, যারা যথাক্রমে কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিআই(এম) দলের শ্রমিকসংগঠন। এই বৈপরীত্য কেন? আবার উল্টোদিক দিয়েও বলা যায় এই তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব কি সত্যি সত্যি নয়া-উদারবাদী জমানায় পুঁজির নিষ্ঠুর হামলার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রকৃত অর্থে লড়াইয়ের ময়দানে সমবেত করতে সমর্থ হবে? কিংবা এরা যে আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে, সেই আন্দোলনকে ঐতিহাসিক লড়াই হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়? এই মুহূর্তে গোটা দেশে চলমান শ্রমিক আন্দোলনের এটা হলো এক দিক। অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে অটোমোবাইল শিল্পে গত তিন বছরে প্রায় ২৫টির মতো উল্লেখযোগ্য শ্রমিক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। হরিয়ানার মানেসরে মারুতি সুজুকি কারখানার শ্রমিক বিক্ষোভ এই প্রসঙ্গে গোটা দেশে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে। এছাড়াও গুরগাঁওয়ের রিকো অটোয়, হুণ্ডার মোটর সাইকেল কারখানায়, পুনের বোসক চেসিসে, বোম্বের মাহিন্দ্রার কারখানায় কথা উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর বর্বর হামলার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা তার মতো করে প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথে হাঁটছে। স্বাধীনভাবে সংগঠিত হচ্ছেন। রাষ্ট্র সর্বশক্তি নিয়ে মালিক শ্রেণীর পক্ষ নিলেও শ্রমিক বিক্ষোভ অব্যাহত থেকেছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস উপেক্ষা করে, মালিকি হামলার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে শ্রমিকরা প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথে অটল রয়েছে। গোটা দেশের শ্রমিক সংখ্যার প্রেক্ষিতে পরিমাণগত দিক দিয়ে এই লড়াইগুলি বিশাল না হলেও গুণগত দিক দিয়ে এই শ্রমিক বিক্ষোভগুলি এক নতুন আশার সঞ্চার জোগাচ্ছে। গত শতাব্দীর '৮০-৯০ এর দশকে এ রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীর ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ধারায় আন্দোলন যে সাড়া ফেলেছিল (প্রসঙ্গত বলা যায় এখন এরাজ্যে এই ধারার আন্দোলন তুলনামূলকভাবে দুর্বল অবস্থায় আছে), আজ অনেকটা সেইভাবে সংগ্রামী ধারার আন্দোলন অল্প হলেও অন্যান্য রাজ্যে বিকশিত হচ্ছে। বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির তথাকথিত 'সেফ জোনে'ও শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটছে। সুতরাং দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের খণ্ডচিত্রের মধ্যেই আমরা শ্রমিক আন্দোলন, তার সমস্যা ও সম্ভাবনাকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো।

এদেশে শ্রমিকদের অবস্থা

এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা হলো প্রায় ৪৬ কোটি। এর মধ্যে ৪২.৭২ হলেন অসংগঠিত শ্রমজীবী। ৪২.৭২ কোটি অসংগঠিত শ্রমজীবীর মধ্যে ৩৮.৫০ কোটি কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, ৪.২২ কোটি কাজ করেন সংগঠিত ক্ষেত্রে। আবার অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে ৩৮.৫০ কোটি শ্রমজীবী মানুষ আছেন তাদের মধ্যে ২৪.৪৮ কোটির ঠিকানা কৃষি ও বাকি ১৪.২ কোটি শ্রমজীবী কাজ করেন অকৃষি ক্ষেত্রে। সংগঠিত শিল্পে অসংগঠিত শ্রমিক এবং অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের না আছে কোন কাজের নিরাপত্তা, না আছে সামাজিক সুরক্ষা। এছাড়াও ঘটছে মজুরি সংকোচন। ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা এখন ১০-১২ ঘণ্টায় পর্যবসিত হয়েছে। ৮ ঘণ্টা কাজের শ্রম-সময়ের জন্য পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর যে ঐতিহাসিক লড়াই যাকে আমরা মে দিবসের লড়াই অভিহিত করি তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মালিকরা ১০-১২-১৪ ঘন্টা কাজ করিয়ে নিচ্ছে। ঠিকা প্রথা

অবলুপ্তি ছিল এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। উৎপাদনের স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকা প্রথা নিষিদ্ধ হলেও মুনাফা আরো মুনাফার জন্য সর্বত্র পুঁজিপতি শ্রেণী ঠিকাপ্রথা চালু করছে। সরকার এই সমস্ত আইন করে, অথচ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরেও ঠিকা প্রথা চালু করা হচ্ছে। শ্রম আইন লঙঘনের ঘটনা আকছার ঘটছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী এদেশে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সংগঠিত শ্রমিকসংখ্যা ৭.৫ কোটি, সাধারণ-ভাবে এদের আছে কর্মনিরাপত্তা বা সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা।

বিগত শতাব্দীর নয়ের দশক থেকে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দু যুগের অবস্থার যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব—

ক) দেশের অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে;
খ) এদের নেই কোন কর্মনিরাপত্তা, নেই কোন সামাজিক সুরক্ষা;
গ) কম মজুরি, মজুরি সংকোচন, শ্রম-আইন লঙ্ঘন, শ্রম-সময় বাড়ানো ইত্যাদি শ্রমিক-বিরোধী আক্রমণ প্রবলভাবে নামছে;
ঙ) ঠিকা প্রথা গোটা শ্রমিক-সমাজে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে;
চ) সংগঠিত শিল্পে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত কমছে;
ছ) সংগঠিত শিল্পে, অসংগঠিত শ্রমিকের (যেমন চুক্তি ভিত্তিক, দৈনিক মজুরি ভিত্তিক) সংখ্যা বাড়ছে;
জ) এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প— সেল, গেল সহ নবরত্নের বিভিন্ন জায়গায়, রেল, প্রতিরক্ষা সর্বত্র— স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে, অস্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা বাড়ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ২০০২ সালে দ্বিতীয় শ্রম কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তাতে স্পষ্ট করে বলেছিল যে গোটা দেশে অসংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, এবং তাদের অসহনীয় অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়, তাদের নেই কোন সামাজিক সুরক্ষা— এই বিষয়টা নিয়ে যদি ভাবা না যায় তাহলে নকশালবাদের মতো সমস্যা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ সরকারি কমিটি ও সমস্যাটির গভীরতা তুলে ধরেছিল এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছিল অসংগঠিত শিল্পের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ যদি নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য রাস্তায় নামেন তা রাষ্ট্রের পক্ষে এক ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে। প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংকটগ্রস্থ হয়ে পড়বে। এই ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য তারা অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য কিছু সুপারিশও করেছিল। ভার্মা কমিশন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, এরকম চলতে থাকলে নকশালবাদ অর্থাৎ সমাজপরিবর্তনের লড়াই গোটা দেশে জোরালো হয়ে উঠবে।

এই সাথে আলোচনা করতে হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গড়ে ওঠা *সেজ*-এর অবস্থা। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে আইন করে শ্রমিকদের কার্যত সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টর গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, কয়েকটি পড়ে না— সেই সব তথ্যপ্রযুক্তি অঞ্চলের বিভিন্ন কর্মীদের কার্যত সংগঠিত হবার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা

লেখা শুরু করেছিলাম, শ্রমিক আন্দোলনের দুটি খণ্ডচিত্র দিয়ে। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, গোটা দেশের শ্রমিক আন্দোলন আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে আছে। পুঁজিপতি শ্রেণীর আক্রমণ প্রতিহত করতে যে চেতনা, একতা, সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে হলেও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধের অস্ত্র হতে পারে তা আজ অত্যন্ত দুর্বল। পুঁজিপতি শ্রেণীর আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণী ছত্রভঙ্গ অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে যে অধিকার শ্রমিকশ্রেণী লড়াই করে অর্জন করেছিল তা একের পর এক কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। লাখ লাখ শ্রমজীবীদের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কমছে শ্রম বিরোধের সংখ্যা, কমছে ধর্মঘটের সংখ্যা।

শ্রমিকদের দমন করার জন্য মালিকশ্রেণীর হাতিয়ার লকআউট, আবার মালিকশ্রেণীর হামলা প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম হাতিয়ার ধর্মঘট। আমরা দেখাব, শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই জোরালোভাবে সমাজে থাকার জন্য বেড়েছে শ্রম-বিরোধের ও ধর্মঘটের সংখ্যা, আবার শ্রমিক আন্দোলন জোরালো ভাবে না থাকার জন্য ধর্মঘটের সংখ্যা কমেছে, শ্রমবিরোধের সংখ্যাও কমেছে। ধর্মঘটজনিত কারণে শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা কমেছে। যেভাবে আজ পুঁজিপতি শ্রেণীর বল্গাহীন আক্রমণ নেমে এসেছে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের প্রকৃত সংগঠন থাকলে ধর্মঘট বাড়ত, ধর্মঘট-জনিত কারণে কমতো শ্রমদিবসের সংখ্যা। কিন্তু সেই অবস্থা নেই বলেই কমছে শ্রমবিরোধের সংখ্যা এবং ধর্মঘটের সংখ্যা। (সারণী দেখুন)

এর পাশাপাশি সংগঠিত শিল্পের শ্রমিক আন্দোলন আজ প্রাতিষ্ঠানিকতা ও গতানুগতিকতায় আক্রান্ত। ভারতের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রেল, ডাক-তার, ইস্পাত, কয়লা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কটন, কেমিক্যাল প্রভৃতি শিল্পের শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বস্তুত, মালিকের ও রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে অতীতে এই সমস্ত শিল্পের শ্রমিকরা বীরত্বপূর্ণ লড়াই লড়েছেন। বহু আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকশিত হয়েছে। সংগ্রামের ফলে নানা অধিকার তারা আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৭৪ সালের রেল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক লড়াই আজও আমাদের উদ্বেলিত করে। আজ ঐ সমস্ত শিল্পগুলিতে রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তিমালিকের আক্রমণ নানাভাবে বেড়েছে। (যার কিছু উদাহরণ আমরা আগেই উল্লেখ করছি)। এই সমস্ত শিল্পগুলির ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রাতিষ্ঠানিক লড়াইয়ের মধ্যে সব লড়াইকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। আবার হাজার হাজার শ্রমিকের সবকিছু মেনে নেওয়ার মনোভাবও কাজ করে চলেছে। নেতাদের প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং গতানুগতিকতা আর শ্রমিকদের মেনে নেওয়ার মনোভাবের জন্য রাষ্ট্র সুকৌশলে অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। বেসরকারি

২০০২ থেকে ২০০৯ সালে ধর্মঘট এবং লক আউটের সংখ্যা

	ধর্মঘট			লক আউট			মোট		
বছর	শ্রম বিরোধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সংখ্যা (হাজার)	নষ্ট শ্রম দিবস (লক্ষ)	শ্রম বিরোধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সংখ্যা (হাজার)	নষ্ট শ্রম দিবস (লক্ষ)	শ্রম বিরোধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সংখ্যা (হাজার)	নষ্ট শ্রম দিবস (লক্ষ)
২০০২	৩০ (৭.৯৮)	৮২.০৭ (৩৫.৫৭)	১১.৯ (৫.৪৪)	৩৪৬ (৯২.০২)	১৪৮.৬৫ (৬৪.৪৩)	২০৬.৮ (৯৪.৫৬)	৩৭৬ (১০০)	২৩০.৭২ (১০০)	২১৮.৭ (১০০)
২০০৩	৩২ (৮.৩৬)	৪৫৮.৭৭ (৭২.৫৩)	১৫.৫ (৫.৮৫)	৩৫১ (৯১.৬৪)	১৭৩.৭৭ (২৭.৪৭)	২৪৮.১ (৯৪.১২)	৩৮৩ (১০০)	৩৬২.৫৪ (১০০)	২৬৩.৬ (১০০)
২০০৪	২০ (৫.৩৫)	২০৫.৫২ (৫৩.৬২)	১৬.৬ (৬.৩৭)	৩৫৪ (৯৪.৬৫)	১৭৭.৭৫ (৪৬.৩৮)	২৪৩.৮ (৯৩.৬৩)	৩৭৪ (১০০)	৩৮৩.২৭ (১০০)	২৬০.৪ (১০০)
২০০৫	২৬ (৬.৭৯)	২১০.৫৩ (৬১.১৬)	৩১.১ (১২.২২)	৩৫৭ (৯৩.২১)	১৩৩.৭১ (৩৮.৮৪)	২২৩.৩ (৮৭.৭৮)	৩৮৩ (১০০)	৩৪৪.২৪ (১০০)	২৫৪.৪ (১০০)
২০০৬	৯ (৩.২৯)	২০০.৫৮ (৬৫.৭৬)	২.৪ (১.২৬)	২৬৫ (৯৬.৭২)	১০৪.৪৪ (৩৪.২৪)	১৮৭.৫ (৯৮.৭৪)	২৭৪ (১০০)	৩০৫.০২ (১০০)	১৮৯.৯ (১০০)
২০০৭	১১ (৩.৮৩)	২৫৭.৬৭ (৬৮.১২)	১৩৩.৫ (৪৩.৭৮)	২৭৬ (৯৬.১৭)	১২০.৫৯ (৩১.৮৮)	১৭১.৪ (৫৬.২২)	৮৭ (১০০)	৩৭৮.২৬ (১০০)	৩০৪.৯ (১০০)
২০০৮	১২ (৪.৪১)	২৫৮.০৩ (৭৫.৭৩)	৩৮.০ (১৯.৪৯)	২৬০ (৯৫.৫৯)	৮২.৬৯ (২৪.২৭)	১৫৭.০ (৮০.৫৭)	৭২ (১০০)	৩৪০.৭২ (১০০)	১৯৫.০ (১০০)
২০০৯	১০ (৩.৬৬)	২৫০.৬৩ (৭৪.৪৮)	৩৯.৬ (২০.৬১)	২৬৩ (৯৬.৩৪)	৮৫.৮৯ (২৫.৫২)	১৫২.৫ (৭৯.৩৯)	৭৩ (১০০)	৩৩৬.৫২ (১০০)	১৯২.১ (১০০)

মালিকরাও অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এখানে রেলের প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি। বিগত বছরগুলিতে রেলে উল্লেখযোগ্য ভাবে কর্মচারী কমেছে, বেড়েছে শূন্যপদের সংখ্যা। মাত্রাতিরিক্ত কাজের বোঝা, চুক্তি ভিত্তিক অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ চলেছে, অথচ নেই রেল শ্রমিকদের মধ্যে কোন জোরালো প্রতিবাদ। অথচ রেলের প্রত্যেক জোনে ইউনিয়ন আছে। তারা নির্বাচিতও বটে। রেলে ইউনিয়ন নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু নেই জোরালো প্রতিবাদ।

এবার আমরা আলোচনা করবো বিগত কয়েকবছর যাবত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে যে ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছে তাকে কি এদেশে পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের এক সূচনা-বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা যায়? বিজেপি-র ট্রেড ইউনিয়ন বিএমএস-এর কেন্দ্রীয় নেতারা, কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন আইএনটিইউসি-র কেন্দ্রীয় নেতারা বা সিটু-র নেতারা কি প্রকৃত একটি লড়াই লড়তে পারে?

আমরা দেখেছি, আজ শ্রমিকদের উপর আক্রমণ নেমেছে বিশ্বায়নের যুগে নয়া-উদারবাদী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে কংগ্রেস ও বিজেপি, রাজ্যস্তরে সিপিআই(এম) এই নীতির সমর্থক। নানাভাবে পুঁজির বিভিন্ন আক্রমণের পক্ষে এরা খোলাখুলি দাঁড়িয়েছে। যে দলগুলি নির্বাচনের সময় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করছে তাকে জেতাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা, আবার শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যুক্তিতে সেই সংগঠনগুলি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ধর্মঘট করাটা দ্বিচারিতা ছাড়া কিছুই নয়। গুজরাটে নরেন্দ্র মোদি শ্রমিকদের ওপর একের পর এক আক্রমণ নামায় তখন বিএমএস মোদি-রাজের পক্ষে ওকালতি করে, আবার খুচরো ব্যবসায় বহু পণ্যের ক্ষেত্রে এফডিআই-এর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার যখন নেয় এরাজ্যের আইএনটিইউসি-র নেতারা তার পক্ষে মিছিল করে। আমরা সিপিআই(এম) জমানায় দেখেছি, কীভাবে সিটু-নেতারা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার নানা প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করার জন্য সক্রিয় ছিল। সুতরাং যাদের কর্মপদ্ধতি প্রধানত শ্রমিক-বিরোধী তারা কীভাবে ঐতিহাসিক লড়াই গড়ে তুলতে পারে? প্রশ্ন আসে, তাহলে এই লড়াইগুলি লড়ছে কেন? এখানে বলা দরকার যে একটি কারণ হলো অসংগঠিত শিল্পের নানা সমস্যা ক্রমবর্ধমান। শ্রমিকদের মধ্যে নানা অসন্তোষ বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা বহু সময়

গতানুগতিক, কিংবা প্রতিষ্ঠানিক লড়াইয়ে গণ্ডীর সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে। শ্রমিক বিক্ষোভের এই যে আঁচ ট্রেড-ইউনিয়ন নেতারা বুঝতে পারছেন, তাই তারা কর্মসূচি নিতে বাধ্য হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, আমরা আগেই বলেছি অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে ভার্মা কমিশন কি বলেছে। যারা আজ আন্দোলনের ডাক দিচ্ছেন তাদের প্রধান লক্ষ্য, যে শ্রমিক অসন্তোষের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন কখনই প্রাতিষ্ঠানিকতা ও গতানুগতিকতার সীমানা না ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ তারা যে দলের অধীন সেই দল বিশ্বায়ন নীতিকে কার্যকর করবে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ। আবার সেই ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তারা ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে আন্দোলন করবে। এ হচ্ছে ''সাপ হয়ে কাটো, ওঝা হয়ে ঝাড়ো।'' আর রবীন্দ্র ভার্মা কমিশনের সতর্কতা তো আছেই— অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা না নিলে 'নকশালবাদের' প্রভাব বাড়বে। অনেকে বলতে পারেন এটা কি 'অতি বামপন্থী ভাবনা' হয়ে যাচ্ছে না? সবকিছুকে নেতিবাচক ভাবনা থেকে দেখা! এই ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে জাগরণ ঘটছে তাকে এই ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না। এই ধর্মঘটগুলির মাধ্যমে শ্রমিক জাগরণ ঘটেছে কিনা ভবিষ্যৎই তা বলবে। শ্রমিক জাগরণের জন্য কেউ কেউ এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতেই পারেন। কিন্তু একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে হবে, যারা আজ এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে, তারা প্রকৃত কোন শ্রমিকজাগরণের পক্ষে দাঁড়াবে না। যদি সত্যি সত্যি এটা তারা করতো তাহলে রাজনৈতিক ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

বিষয়টি একটু অন্যভাবে আলোচনা করা যায়। গত শিল্প ধর্মঘটে ঠিকা প্রথার অবসান অন্যতম বিষয় ছিল। আমরা সাম্প্রতিক অতীতে দেখেছি যে মানেসরের সুজুকি কারখানার শ্রমিকরা এক অনবদ্য লড়াই চালাচ্ছে বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে। এমনকি ঠিকা শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে স্থায়ী শ্রমিকরা ধর্মঘটও করেছে। শ্রমিকদের সংগঠিত করার অধিকার কেড়ে নেবার জন্য বহুজাতিক সংস্থা সুজুকি কর্তৃপক্ষ এবং হরিয়ানা সরকার প্রবল দমন পীড়ন নামিয়ে এনেছে। স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক মিলে ৭০০-র মতো শ্রমিক গেটের বাইরে, ১৫০ জনের বেশি জেলবন্দী, আরো বহু শ্রমিকের বিরুদ্ধে পুলিশ ফৌজদারি মামলা করেছে। একটি বহুজাতিক অটোমোবাইল সংস্থার জন্য শ্রমিকের উপর এই ভয়ংকর দমনপীড়ন চালাচ্ছে হরিয়ানা সরকার। তাদের এই সংগ্রাম গোটা দেশের শ্রমিক আন্দোলনে সুবাতাস নিয়ে এসেছে। যদি সত্যি সত্যিই ঠিকা প্রথার বিরুদ্ধে কিংবা বহুজাতিক সংস্থার আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতারা প্রকৃত লড়াই গড়তে চাইত, তাহলে একটাই আওয়াজ তারা তুলত গোটা দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে— এসো সবাই মারুতি সুজুকি শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াও। সমগ্র দেশের শ্রমিককের জমায়েত করতো গুড়গাও-মানেসরে। আওয়াজ তুলত, মারুতি সুজুকি শ্রমিকের দাবি না মানলে আমরা বহুজাতিক মারুতি সুজুকিকে চলতে দেবো না, দেশ জোড়া আলোড়ন করবো। ঘটনাপ্রবাহ অন্য দিকে গড়াতো। কিন্তু এ কাজ তারা করবেনা। কারণ নিজেদের অবস্থানগত কারণেই সমস্ত লড়াই তারা প্রাতিষ্ঠানিকতা-গতানুগতিকতায় বেঁধে রাখবে। এবং শ্রমিক বিক্ষোভ যেন কোনভাবেই রাষ্ট্রবিরোধী লড়াইয়ের পথে না যায় সেই কাজই তারা করবে। সুতরাং ২১-২২-এর ধর্মঘট দিয়ে দেশে শ্রমিক জাগরণ ঘটবে বলে যারা বিশ্বাস করেন তারা সম্ভবত ভুলই করছেন।

এবার আসা যাক বিভিন্ন জায়গায় সংগ্রামী ধারায় যে আন্দোলনগুলি চলেছে তার সমস্যা ঠিক কোথায়? গত দু দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, কারখানাভিত্তিক বা শিল্পভিত্তিক স্তরে এই লড়াইগুলি প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিলেও একটা পর্যায়ের পর এই লড়াইগুলি দুর্বল হতে শুরু করে। লড়াকু শ্রমিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ যোগসূত্র গড়ে না ওঠার জন্য মালিকি ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের মুখে পড়ে লড়াকু শ্রমিকরা দম হারিয়ে ফেলে। তাদের আন্দোলনের সমর্থনে সামাজিক ভাবে নাড়াচাড়া না থাকাটাও এর অন্যতম কারণ। আবার এই লড়াইগুলি গড়ে ওঠে প্রধানত অর্থনৈতিক দাবির উপর। কিংবা শ্রমিকদের সংগঠিত হবার প্রয়াসকে যখন কর্তৃপক্ষ প্রবলভাবে বাধা দেয় সেই সময়। এর একটা আশু সমাধান হলেই কিংবা একটা প্রাথমিক বিজয় পেলে তার পরবর্তী ধাপ কীভাবে সংগঠিত হবে সে সম্পর্কে কোন অবস্থান তারা গ্রহণ করতে পারেনা। সুতরাং বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের যে নড়াচড়া শুরু হয়েছে, সংগ্রামী শক্তির বিকাশ ঘটছে, একে সার্বিকভাবে বিকশিত করার কর্মসূচি এই সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের সামনে রাখতে না পারলে বিকল্প এই লড়াইগুলিও শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

শ্রমিক আন্দোলনের আজকের বাস্তবতায় যে লড়াইগুলি গড়ে উঠেছে তা প্রধানত ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে সীমাবদ্ধ। আবার আজকের পর্যায়ে একটা বড়ো অংশের শ্রমিকই ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্ভবও ঘটেছিল শ্রমিক সংগ্রামের মধ্য থেকেই। পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে আমরা দেখতে পাই শ্রমিকশ্রেণী তার অধিকার অর্জন করেছিল বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে। বেশির ভাগ শ্রমিকের সক্রিয় অংশগ্রহণে উজ্জ্বল হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলন। প্যারি কমিউন, মে দিবসের লড়াই, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লবের পর্যায় অতিক্রম করার পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ভাবে দীর্ঘকালীন পর্যায় জুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর পিছু হটার পালা চলছে। এর ছাপ এদেশের

শ্রমিকশ্রেণীর উপর পড়েছে। শ্রমিক বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণ তো দূরের বস্তু, এক বড়ো সংখ্যক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকেও নিজেদের বিয়োজিত (Alienate) করে নিয়েছে। এটা একটা গুরুতর সমস্যা হিসাবে আজ শ্রমিক আন্দোলনের সামনে হাজির হয়েছে।

এবার অন্য একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যাক। সেটা হলো, শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ-রাজনীতি গোটা সমাজে তুলনামূলক দুর্বল অবস্থায় থাকার কারণে শ্রমিক আন্দোলন সঠিক ধারায় বিকশিত হচ্ছে না। পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বাস্তব অবস্থান থেকে লড়ে, আবার একটা অংশ এখানে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ শ্রমিক সংগ্রাম মানে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম নয়। ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম অবশ্যই শ্রমিক সংগ্রামের একটি অংশ, কিন্তু সমগ্র নয়। শ্রমিক সংগ্রামের অন্যতম বিষয় হলো, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির দৃষ্টিকোণে নিজেরা শ্রেণীগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। পুঁজির পাহারাদার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও রাজনীতিকে পরাস্ত করে শ্রেণীগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যান্য শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সে পুঁজির বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াই গড়ে তোলে। শ্রমিক আন্দোলনে এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসাবে থাকে। শুধুমাত্র ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিক সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকলে তা শেষ বিচারে পুঁজির হামলার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আজ গোটা দেশে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির এই কাজ ভয়ংকর দুর্বল অবস্থায় আছে। তার সামনে নেই কোন ঐক্যবদ্ধ আধার। যে আধারের নেতৃত্বে ধারাবাহিক অন্যান্য সংগ্রামের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক লড়াইও বিকশিত হবে। সুতরাং আজ যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের মাধ্যমে নতুনভাবে শ্রমিকদের জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তারা গ্লানি কাটিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, এই মুহূর্তে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামকে বিকশিত করার সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির উপর বিভিন্ন প্রকারে বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করাও জরুরি হয়ে উঠছে। এবং তা যতই দুর্বল প্রক্রিয়া হোক না কেন এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনের সামনে একটা কথা জোরের সাথে রাখতে হবে। একটা বা দুটো পুঁজিপতি নয়, গোটা পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু, পরাস্ত করতে হবে পুঁজিবাদকে, শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগোতে হবে। একটু যান্ত্রিক যদি হয় ক্ষতি নেই, আজকের প্রতিটি শ্রমিক সংগ্রামের সামনে এই রাজনীতি রাখতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক লড়াই জোরদার না হলে আজকের ট্রেড ইউনিয়ন করে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা অচিরেই শুকিয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র : লেবার ইন ওয়েস্টবেঙ্গল এবং ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে রিপোর্ট

জেলের চিঠি

৮ পৃষ্ঠার পর

এগিয়ে আসে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হচ্ছে। (মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রভিশনাল ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য ইমরান খান, তার নাম এফআইআর, চার্জশিট বা এসআইটি রিপোর্টে ছিল না এবং আরো ৬৫ জন শ্রমিক, যাদের জামিন-অযোগ্য অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে)। জেলে থাকা শ্রমিক বা ছাঁটাই শ্রমিকদের কারোরই তাদের উপর নির্ভরশীল মানুষদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কোনো জীবিকার সংস্থান নেই। ফলে এরা সবাই মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু, এই সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও জেলের বাইরে থাকা আমাদের সহকর্মীদের ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম জেলের মধ্যে আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে। এই সংগ্রাম কারখানার বাইরে সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে ৮ মাসের বেশি সময় ধরে। দেশের বিভিন্ন অংশের শ্রমিক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমরা যে সমর্থন পাচ্ছি সেটা আমাদের আশা জাগাচ্ছে, আমাদের মনকে উজ্জীবিত করছে।

এই ৮ মাসে এমন কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই যার দরজায় আমরা ঘা দিই নি। ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের আবেদন নিয়ে শ্রমমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেছি। কিন্তু আমাদের কথা শোনার বদলে সরকার কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ও মালিকদের দিকে ঝুঁকে থাকতে বদ্ধপরিকর। আত্মহত্যা বা হত্যা করার মতো অবস্থায় পৌঁছানোর আগে শেষ বারের মতো আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের যেন ন্যায়বিচার দেওয়া হয়, যে ন্যায়বিচার আমাদের প্রাপ্য।

আপনাদের সমর্থন ও মন্তব্য পাওয়ার আশা রাখি।

মারুতি সুজুকি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
(রেজি. নং ১৯২৩, আইএমটি মানেসার)

স্মরণ : আসগার আলি ইঞ্জিনিয়ার

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যুদ্ধের একনিষ্ঠ সৈনিক ইসলাম বিশেষজ্ঞ আসগার আলি ইঞ্জিনিয়ার ৭৪ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ১৪ মে, ২০১৩। কর্মসূত্রে মুম্বই পুর নিগমের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আসগার আলি প্রায় ৫০টির বেশি বই রচনা করেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বড় ক্ষতি। তাঁর এই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভূমিকাকে 'অনীক' অভিবাদন জানায়।

শ্রম ও শ্রমিক

আন্তর্জাতিক সংহতি লক্ষ্য হোক শ্রমজীবী মানুষের

আশিসকুসুম ঘোষ

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবিদার ভারতবর্ষে দু-দশকের বেশি সময় ধরে চলছে এক উন্নয়ন যজ্ঞ। গ্রামীণ ভারতে, জঙ্গলে বসবাসকারী ও সমুদ্র-নদী উপকূলে বংশপরম্পরায় বসবাস ও রুজিরোজগার থেকে ঝড়ের গতিতে উচ্ছেদ হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে প্রধান চরিত্র গফুর মিঁয়ার সকল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেঁচেবর্তে থাকার জন্য ছিল ছিন্নমূলের যন্ত্রণা নিয়ে কলকারখানার জীবন। এখন যারা ভিটেমাটি-জল-জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন তাদের বাঁচার জন্য কী পথ খোলা আছে? মানুষ আজ আক্রান্ত।

সব থেকে বেশি আক্রান্ত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। ২০১১ সালের হিসেবে ভারতে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৪৮.৭ কোটি, দ্বিতীয় বৃহত্তম। চীনের ৭৯.৫ কোটির পরেই। আমেরিকায় শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৫.৪ কোটি। ভারতে বর্তমানে ৪৮.৭ কোটি শ্রমজীবী মানুষের ৯৪ শতাংশ কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন ৬ শতাংশ শ্রমজীবী। এই সংখ্যা ২০০৮-এর হিসেবে ২.৭৫ কোটি, যার মধ্যে সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত ক্ষেত্রে কাজ করেন ১.৭৩ কোটি। ভারতের শ্রমজীবী মানুষের ৬০ শতাংশ কৃষিতে, ১২ শতাংশ শিল্পে এবং ২৮ শতাংশ বিভিন্ন সারভিস সেক্টরে কাজ করেন।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর যাদের চিহ্নিত করেছে তারা হচ্ছে ছোট এবং প্রান্তিক চাষি, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি, জেলে, পশুপালনকারী, বিড়ি শ্রমিক, প্যাকেজিং ও লেভেলিং, নির্মাণ শ্রমিক, চামড়ার কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, তাঁতি, কুমোর, কামার, নুন তৈরির সাথে যুক্ত শ্রমিক, ইটভাটা ও পাথর ভাঙার কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, করাত কল ও তেল কলে নিযুক্ত শ্রমিক প্রভৃতি। এছাড়াও দেশীয় পানীয় তৈরির সাথে যুক্ত শ্রমিক, ঝাড়ুদার, কুলি, গাড়োয়ান, মাল ওঠানো-নামানোর শ্রমিকও অসংগঠিত ক্ষেত্রে আছে। আরও যারা পরিষেবা দেন যেমন দাইমা, বাড়ির কাজের লোক, নাপিত, সবজি ও ফল বিক্রেতা, খবর কাগজ বিক্রেতা, ফুটপাতের হকার, হাতে টানা গাড়ির চালক এবং ছোট ছোট দোকানের কর্মচারী, তারাও এই অংশে অন্তর্ভুক্ত। আরও যারা এই ক্ষেত্রে আছেন তারা হচ্ছেন কৃষি শ্রমিক, বাঁধা শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিক।

এই বিপুল সংখ্যার শ্রমিকদের কাজের স্থায়িত্ব নেই। ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত নয়। কাজের সময় সীমা ৮-১২ ঘণ্টা। জীবন ধারণের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা এরা ভাবতেও পারে না।

১৯২০ সালে ভারতে প্রথম কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়ন তৈরি হলেও, সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কিছুটা সংগঠিতভাবে মালিকের সাথে দরকষাকষির জায়গায় থাকলেও, অসংগঠিত ক্ষেত্রে একেবারে নৈরাশ্যজনক অবস্থা। ভারতে ট্রেড-ইউনিয়নগুলি প্রায় সব কটিই দলীয় রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে বিভক্ত। ২০০২ সালের কেন্দ্রীয় শ্রমদফতরের হিসেবমত সব ট্রেড-ইউনিয়ন মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা ২৪,৬০১,৫৮৯ জন। এর মধ্যে ১১টি কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত ট্রেড-ইউনিয়ন কেন্দ্র আছে। এর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ ট্রেড-ইউনিয়ন আইএনটিইউসি ২২ লক্ষ সদস্য পদের দাবিদার হলেও সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের মাত্র ০.৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০১০ সালের হিসেবে ৯৮ শতাংশ ভারতীয় শ্রমিক কোন ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্য নয় এবং মালিকের সাথে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে কোনরকম চুক্তির মধ্যে নেই। অর্থাৎ মালিকের খেয়ালখুশি তাদের চাকুরির একমাত্র শর্ত।

ভারতের বিপুল পরিযায়ী শ্রমিকদের মূলত দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রায় ৪০ লক্ষ দক্ষ ও অ-দক্ষ ভারতীয় পরিযায়ী শ্রমিক মধ্য-প্রাচ্যের দুবাই, বাহেরিন, কাতার ও পারসিয়ান গাল্ফ অঞ্চলে কাজ করে, মূলত নির্মাণ শিল্পে। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে উদ্বোধন হওয়া পৃথিবীর ইতিবাসে সব থেকে উঁচু বাড়ি 'বুর্জ খালিফা' নির্মাণে ভারতীয় শ্রমিকদের বিশেষ অবদান আছে। যদিও এরা ৪০-৮৫ শতাংশ কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য থাকে।

দেশের এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে গিয়ে কাজ করে প্রায় ৪২ লক্ষ শ্রমিক। কেউ পুরো দিনের কাজ বা আংশিক সময়ের কাজ করে, কখনো স্থায়িভাবে বা অস্থায়িভাবে। মালিক বা ঠিকাদারের মর্জি নির্ভর এদের রোজগার বা কাজ-পাওয়া।

দেশের ২০০১ সালের সেনসাস অনুসারে ১.২৬ কোটি শিশু-শ্রমিক (৫-১৪ বছর) আংশিক বা পুরো সময়ের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিভিন্ন সময় দেশে ও বিদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে এবং শিল্পে শান্তি ও মুনাফার হার বজায় রাখতে ভারতে শ্রমিকদের জন্য ৫০টি প্রধান আইন আছে। তার মধ্যে অনেকগুলি আইন ব্রিটিশ জমানার এবং বেশ কিছু স্বাধীন ভারতে গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে শ্রম যৌথ তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের দায়িত্বে আছে। তার ফলে প্রধান ৫০টির বাইরে আরও অসংখ্য আইন ও অধিকার শ্রমিকদের আছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিভিন্ন সুপারিশ শ্রমিক স্বার্থে প্রয়োগ করার নৈতিক দায় কেন্দ্রীয় সরকারের আছে, কারণ ভারতবর্ষ আইএলও সংস্থায় অংশগ্রহণকারী দেশ।

পরিষেবা ক্ষেত্রে, যেমন ব্যাঙ্ক, ওষুধ, বিমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বস্ত্র শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি ও বিপিও সংস্থা, সংগঠিত রিটেল, পর্যটন, খনি, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদিতে যারা কাজ করেন তারাও দুধে-ভাতে নেই। এই অংশের বহু শ্রমিক ইউনিয়নভুক্ত না হওয়ায় মালিকেরা ইচ্ছেমতো সময় ধরে কাজ করায় এবং প্রয়োজনে আইনি সুরক্ষাকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে এবং প্রয়োজনে জোর খাটিয়ে ইস্তফাপত্র নিয়ে নেয়।

জোট-বদ্ধতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। বেঁচেবর্তে থাকতে গেলে লড়াই করতে হয়। লড়াই করা এবং তাকে আরও জোরদার করতে প্রয়োজন সংঘ-শক্তি। বিগত দিনের ইতিহাসে দেখা গেছে, শ্রমিকরা জোটবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করেছেন এবং বহু অধিকার আদায় করেছেন। অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি ও সংগ্রাম সেইসকল লড়াইকে পরিপুষ্ট করেছে। বিশ্বায়নের ধাক্কায়, বহু-বিভাজিত শ্রমিকদলগুলি রাজনৈতিক দলগুলির ঊর্ধ্বে উঠে শ্রমিক সংহতির চেষ্টা করতে বাধ্য হচ্ছে। সংগঠনের প্রান্তিক সদস্যদের ঐকান্তিক চাপে সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সংগ্রামী ট্রেড-ইউনিয়নগুলি মিলিতভাবে কয়েকটি সংগত দাবি নিয়ে স্বাধীন ভারতে এই প্রথম দু-দিনের ভারতবন্ধের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়। অতীতে এইরকম একদিনের শিল্প-ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েকটি রাজ্যে তা সর্বাত্মক বন্ধের পর্যায় গেলেও রাজনৈতিক গদির লড়াইয়ের অঙ্কে শ্রমিকরা প্রতারিত হয়েছেন। এই জাতীয় ধর্মঘট তার ধার ও ভার হারিয়ে প্রতীকী রূপ নিয়েছে। আগের ধর্মঘটের মাধ্যমে লড়াই-লড়াই খেলায় বীতশ্রদ্ধরা এবারের ধর্মঘটের গভীরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা বুঝতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন এবং ফলে অনেক জায়গায় বিরোধিতা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভাষা দিবসের প্রাসঙ্গিকতা এনে বিষয়টিকে লঘু করার চেষ্টা হয়েছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমজীবী মানুষ দু-দিনের ভারতবন্ধকে অনেকাংশে সফল করেছেন। কারখানার মধ্যে পুলিশ ও সিকিউরিটির রক্তচক্ষুর সামনে যন্ত্রের মতো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকা মারুতি কারখানার শ্রমিকরাও আশার আলো দেখছেন। আশান্বিত হচ্ছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষ।

পুঁজিবাদীদের বিশ্বায়ন তথা লুণ্ঠনকে রুখতে গেলে বিশ্বের শ্রমশক্তির মেলবন্ধন আশু কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ইনটারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিক গঠন করে। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, শ্রমিকদের আশা-আকাঙক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে। লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক যা কমিনটার্ন নামে খ্যাত, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ব্যর্থতায় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ১৯৪৩ সালে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৩৮ সালে লিওঁ ট্রটস্কির নেতৃত্বে চতুর্থ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা হয় কমিনটার্নের বিপরীতে। চতুর্থ আন্তর্জাতিক আজ বহুধা বিভক্ত অস্তিত্ব নিয়ে আছে।

ল্যাটিন আমেরিকায় হুগো স্যাভেজ কিউবা সহ বিভিন্ন দেশের সাথে সহমতে এবং লিগ অফ ফিফ্‌থ ইন্টারন্যাশনালের সমালোচনা সহ সমর্থনে, পঞ্চম আন্তর্জাতিকের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

পুঁজি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা-তাত্ত্বিক ও বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা বহু হলেও শ্রম নিয়ে আক্রান্তরা ব্যতীত আর বিশেষ ভাবনা-চিন্তা দেখা যাবে না। শ্রম বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। সেলস্ কর্মীদের শ্রম, কারখানা কর্মীদের শ্রম, এনজিও কর্মীদের শ্রম, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের শ্রম, মাল ওঠানো বা নামানো শ্রমিকের শ্রম, খেত মজুরের শ্রম, ব্যাঙ্ক কর্মীদের শ্রম এক গোত্রের নয়। শ্রমের মহিমা ভিন্নতর, তাই মর্যাদার তারতম্য থেকে যায়। বিশ্বের অনেক দেশেই কায়িক শ্রমের কর্মীরা তাদের মর্যাদা আদায় করেছেন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছেন। আমাদের দেশে কায়িক শ্রম যারা করেন এবং সে ধরনের জীবনযাপন করতে বাধ্য থাকেন তা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এছাড়া সামাজিক শ্রমের কথা এখন আলোচিত হয় না। অসংগঠিত বহুক্ষেত্রে শ্রমসময় ৮-১৮ ঘণ্টা হয়েছে। দ্রব্যমূল্যর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে কমেছে রোজগার। ক্রমশ হ্রাস হচ্ছে বৃহৎ সংখ্যার শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার।

ধনতন্ত্রের পীঠস্থান এবং ভুবনগ্রামের মোড়ল আমেরিকার অর্থনীতি বেআব্রু হয়ে পড়েছে, ''ডাবল্-ডিপ্ ক্রাইসিস'' সামলাতে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সকল মার্কিনদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মৌলিক বিষয়ে জোর দিয়েছেন এবং প্রতি ঘণ্টায় শ্রমের মূল্য ৯ ডলার করার প্রস্তাব করেছেন। 'আওয়ার ওয়ালমার্ট' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে গত ২৩শে নভেম্বর শ্রমিকরা সারা আমেরিকা জুড়ে ৪৬টি এলাকায় ওয়ালমার্টের ১০০০ দোকানে তালা খুলতে দেয় নি। ধর্মঘটিরা পূর্ণ সময়ের কাজ, উপযুক্ত মাত্রায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ এবং প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনতম ১৩ ডলার মজুরি দাবি করেছেন। বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করছে ওয়ালমার্টের ৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম ধর্মঘট। ওয়ালমার্ট শ্রমিকদের প্রতিবাদে উৎসাহিত হয়ে বিক্ষোভের পথে ম্যাকডোনাল্ড, ভিক্টোরিয়াস সিক্রেট, ডানকিন ডোনাটস সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মীরা।

ক্ষুধাপীড়িত ৮৮টি দেশের মধ্যে ৬৭তম স্থানের অধিকারী আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণায় এসেছে 'জবলেস গ্রোথের' পরিসংখ্যান।

সম্পদের জনমুখী পুনর্বিন্যাস, উৎপাদন ও বণ্টনের উপর শ্রমজীবীদের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কোনভাবেই এই পচাগলা বিশ্বব্যবস্থা থেকে মুক্তি নেই। এই বিশ্বাস শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আর একটি আন্তর্জাতিকের প্রয়োজন। প্রয়োজন পথে নেবে পথ চলার। দায় ও দায়িত্ব শুধুমাত্র শ্রমিকদের নয়, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রবন্ধ

ধর্ষণ, ভার্মা কমিশন ও নতুন আইন

রূপা আইচ

শুরুর কথা

১৬ ডিসেম্বর ২০১২, দিল্লির চলন্ত বাসে যে গণধর্ষণ ও নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল, যার জেরে উত্তাল হয়েছিল রাজধানী সহ সারা দেশ, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল, সেই অত্যাচারিতা-ধর্ষিতা মেয়েটি অসীম সাহসিকতা ও মনের বল দেখালেও, শারীরিক ক্ষত তার আর সারানো যায়নি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে সেই মেয়ে মারা যায় ২৯ ডিসেম্বর। এই ঘটনার প্রতিবাদে শোকস্তব্ধ মোমবাতি মিছিল থেকে সরব প্রতিবাদ সারা দেশ জুড়ে ধ্বনিত হয়। নতুন করে উঠে আসে নানা দাবি-দাওয়া।

দাবি ওঠে ধর্ষকের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ডের। দাবি ওঠে রাষ্ট্র ও তার ব্যবস্থাপনা— সরকার, পুলিশ-প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার কাছে। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন, মহিলা আদালত গঠন, সিসিটিভি আরো বেশি সংখ্যায় ও আরো বেশি এলাকায়। রাতে বেশি বাস চালানো, আলো জ্বালানো, পুলিশকে মামলা নথিভুক্ত করাতে বাধ্য করানো, দ্রুত বিচারের নিষ্পত্তি ইত্যাদি অনেক কিছু। প্রশ্ন উঠলো সমাজে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নারীর অধস্তন অবস্থান, নারীর প্রতি পুরুষের হিংসার নানা রূপ, রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক চেহারা— এসব কিছু নিয়ে। প্রশ্ন উঠলো প্রশাসন-বিচারব্যবস্থায় বেশি বেশি নারী নিয়োগ কি মেয়েদের সম্মান রক্ষার গ্যারান্টি? পুরুষতন্ত্রের বাহক তো শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও। তাছাড়া শুধু পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে গড়ে উঠবে যে রাষ্ট্র, যত কঠোরতম হবে আইন— গণতান্ত্রিক পরিবেশ কি ততই বিঘ্নিত হবে না? কাশ্মীর ও উত্তরপূর্ব ভারতে সামরিক বাহিনীর আধিক্য, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সামরিক শাসনের ইতিহাস উদাহরণ হিসেবে উঠে আসে।

রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

দিল্লির গণধর্ষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধামাচাপা দিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকরা দ্রুত নানা অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন— নারীদের সম্মানহানির অভ্যাস অঙ্কুরে বিনাশ করাই হলো আসল দাওয়াই। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা— যেখানে নারীদের উদ্দেশ্যে টীকা-টিপ্পনি, অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি বা ইঙ্গিত ইত্যাদি অপরাধের বিচার করা হয়— তার সংশোধন করা দরকার। রাষ্ট্র মনে করছে, যে কোনো ধরনের নারী নির্যাতন মামলায় দোষীদের নাম-ধাম-ছবি সহ জাতীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের সব থানাকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জুড়ে দেওয়ার প্রকল্প নেওয়া দরকার— তার নাম দেওয়া হলো 'ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনাল ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিস্টেমস' (সিসিটিএনএস)। দ্রুত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত ও চার্জশিট গঠন, বিচার-বিভাগীয় প্রক্রিয়ার অন্যান্য ফাঁকফোকর মেরামত, ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট দ্রুত পাওয়ার জন্য ল্যাবরেটরির কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি, ৩০-৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট পেশের সময়সীমা ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি আকারে উঠে এল।

গঠিত হলো জাস্টিস ভার্মার নেতৃত্বে কমিশন। ফৌজদারি আইন সংশোধন করার জন্য এই কমিশন নিযুক্ত হয়। নারীদের বিরুদ্ধে যৌন হিংসা দূর করার জন্যে অপরাধীর দ্রুত বিচার এবং দ্রুত শাস্তিদানের জন্য আইনি কার্যকলাপ বা ব্যবস্থাপনা নির্ণয় করবেন এই কমিটি। ৩০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হলো কমিশনকে। সাধারণ মানুষ ও নানা সংগঠনের কাছে এই কমিশনের কাছে মতামত পাঠানোর কথাও ঘোষিত হল।

জাস্টিস ভার্মা কমিশনের রিপোর্ট

জাস্টিস ভার্মা কমিশন, তাদের কাছে পেশ হওয়া যাবতীয় প্রস্তাব বিচার-বিবেচনা করে ২৯ দিনের মাথায় রিপোর্ট পেশ করলেন। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাব হলো—

১) ধর্ষণের সংজ্ঞা : ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় (১৮৬০) যৌন হেনস্থার যে সংজ্ঞা ছিল তাকে ব্যাখ্যা করা হ'ল। কমিশনের মতে, ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা শুধু অপরাধ-প্রবণতা নয়, এটি ক্ষমতার এক ধরনের অভিব্যক্তি। তাই ধর্ষণকে পৃথক বর্গের অপরাধপ্রবণতা হিসেবে দেখা উচিত। কেবল যোনিপথে লিঙ্গ অনুপ্রবেশ, মুখ ও পায়ুসঙ্গম নয়, যৌন প্রকৃতির যে কোনো ধরনের অননুমোদিত অনুপ্রবেশকেই ধর্ষণ বিবেচনা করতে হবে।

IPC-তে বিবাহ এবং বিবাহ-বহির্ভূত ধর্ষণকে পৃথক করা হয়েছে। IPC অনুযায়ী অনুমোদন ছাড়া যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ— যদিও স্বামী স্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া সঙ্গম করলে, তা ধর্ষণ বলে বিবেচিত হবে না। কমিশন মনে করে, বৈবাহিক ধর্ষণের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী বিচারকে বাদ দেওয়া উচিত। বিবাহকে যৌনক্রিয়ার অপরিবর্তনীয় সম্মতি বলে ভাবা উচিত নয় বলে কমিশন মনে করেন। এখানে অনুমোদন বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ষিত ও ধর্ষণকারীর মধ্যেকার সম্পর্ক বিবেচ্য নয়।

২) নারীর ওপর বলপ্রয়োগকে শ্লীলতাহানির সঙ্গে এক করে দেখা হয় কিন্তু 'outraging the modesty of women' কথাটির কোনো ব্যাখ্যা করা নেই। তাই যেখানে লিঙ্গ-প্রবেশ প্রমাণ করা যায়, সেক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ঘটনাটিকে ৩৫৪ ধারা অনুযায়ী ধর্ষণ রূপে বিচার করা হয়।

ভার্মা কমিশন, যৌনঅঙ্গের অনুপ্রবেশহীন যৌনস্পর্শের বিভিন্ন রূপকে যৌনধর্ষণ রূপে বিচার করার কথা বলেছেন। যৌনধর্ষণকে

যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন যাতে অননুমোদিত অনুপ্রবেশহীন সকল যৌনক্রিয়াকে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যৌনক্রিয়ার প্রকৃতি পরিস্থিতি সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে।

যৌনধর্ষণের শাস্তি ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা, অথবা উভয়ই হতে পারে।

(৩) মৌখিক যৌন ধর্ষণ : যৌন শব্দ উচ্চারণ বা অঙ্গভঙ্গির ক্ষেত্রে IPC ৫০৯ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই প্রযোজ্য। এই ধারা নাকচ হওয়া উচিত। কমিশনের পরামর্শ, একে যৌনধর্ষণ রূপে ধরতে হবে, কারণ এগুলো অবাঞ্ছিত যৌন হুমকি রূপেই নারীদের কাছে আসে। এর জন্যে অপরাধীর ১ বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

(৪) যৌন হয়রানি : কর্মক্ষেত্রে নারীর যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে (নিবারক, নিষিদ্ধকরণ, সংশোধক) ২০১২-র বিল, যা পার্লামেন্টে সবেমাত্র পাশ হয়েছে, তার উপর কমিশন কিছু প্রস্তাব দেয়—

i) গার্হস্থ্য শ্রমিক / গৃহপরিচারিকাদের এই বিলের আওতায় আনতে হবে;

ii) বলা হলো, ‘ Under the Bill, the complainant and the respondent are first required to attempt conciliation;

iii) কর্মচারী বা শ্রমিককে, হেনস্থা হওয়া নারী সহকর্মীকে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

iv) বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীকে একটি ‘অভ্যন্তরীণ অভিযোগ গ্রহণ কমিটি’র কাছে অভিযোগকে আবশ্যিক-ভাবে ফাইল করতে হয়। এই কমিটি উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ। তাই একটি 'Employment Tribunal' গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যেখানে এ ধরনের সমস্ত অভিযোগ বিচার করা হবে।

v) অ্যাসিড ছুঁড়ে আক্রমণ করা : কমিশন লক্ষ্য করেন, এই অভিযোগটি under the previous of griveous hurt বিচার হয়নি। এতে ৭ বছরের জন্য জেলের কথা বলা হয়েছিল। ২০১১-র ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্টে বিলে এর জন্য দশ বছরের কারাদণ্ডের কথা বলা হয়। কমিশন প্রস্তাব দেয় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার হেনস্থা হওয়া নারীকে ক্ষতিপূরণ দেবে।

vi) উপদ্রুত অঞ্চলগুলোতে নারীর ওপর যে হিংসা হয়— Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) প্রচলিত রয়েছে যে অঞ্চলগুলোতে সেখানে নিয়মিত নজরদারি দরকার।

কমিশনের প্রস্তাব, উপদ্রুত এলাকাগুলোতে বিশেষ কমিশনার নিয়োগ করা হোক, যিনি যৌন ধর্ষণের বিষয়টির উপর নিয়মিত নজর রাখতে পারবেন।

vii) পাচার : কমিশনের মতে 'Immoral Trafficking Act' (1956)-তে ট্রাফিকিং বা পাচারকে পূর্ণাঙ্গরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। কেবল দেহব্যবসার উদ্দেশ্যে ট্রাফিকিং বা পাচারকে ‘অপরাধ’ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কমিশনপ্রস্তাব দেয় যে, অযৌন দাসত্বের ক্ষেত্রেও ট্রাফিকিং-কে অপরাধ হিসাবে ধরতে হবে, যেখানে হুমকি, গায়ের জোর বা প্ররোচনা ব্যবহার করা হয়েছে।

viii) শিশুদের ওপর যৌন হেনস্থা : 'Juvenile Justice Act' (2000)-এ 'harm' এবং 'health' পরিভাষা দুটিকে সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব দেয় কমিশন। মানসিক-শারীরিক এবং স্বাস্থ্য— দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়।

ix) নারীর প্রতি হিংসার জন্য শাস্তি : কমিশন লিঙ্গকর্তনকে বাতিল করে, যেহেতু তা ধর্ষণের সামাজিক ভিত্তিকে বিচার করতে ব্যর্থ হয়। তাঁদের মতে, ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে না। কারণ বহু উদাহরণ আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুদণ্ড গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ কমাতে পারেনি। কমিশন তাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনুমোদন করেন।

x) ধর্ষিত-র ডাক্তারি পরীক্ষা : কমিশন 'two finger' Test বন্ধ করার সুপারিশ করেন। কমিশনের মতে, ধর্ষিতার পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতাকে কোনমতেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

xi) পুলিশ প্রশাসনের সংস্কারের জন্যে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপের কথা বলেন কমিশন। State Security Commission গঠন, যার প্রধান হবেন মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কমিশন এর একটি বৃহৎ নীতি নির্দেশনা প্রস্তাব করেন। একটি Police Establishment Board গঠন করার কথা বলেন। এই কমিটিতে Director General of Police এবং Inspector General of Police-এর ন্যূনতম দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

xii) কমিশন একটি 'Rape Crisis Cell' গঠনের কথা বলেন। অভিযোগকারী হেনস্থার ঘটনা আগে এখানে জানাবেন। CCTV বসানোর কথা বলা হয়। অভিযোগকারী online অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগকারীর সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তার জন্য পুলিশকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। পুলিশ পদাধিকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্ষণ মামলা

অধিকাংশ নারী সংগঠন ধর্ষণ, নারীর শরীর, গর্ভপাতের অধিকার ইত্যাদি বিষয়কে যেটুকু বা গণ্য করে, পুলিশি হেফাজতে রাজনৈতিক নারী-বন্দীদের নির্যাতন তাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। অথচ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নারীর বড় শত্রু। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণে বাধা দেবার অন্যতম হাতিয়ার এটি। এর অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় উত্তরাখণ্ড, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, কাশ্মীরের মেয়েদের ওপর সেনাবাহিনীর গণধর্ষণে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রাজনীতির দিক থেকে না দেখে অনেক সময় একে ব্যক্তিগত

মামলা রূপে দেখা হয়। যেমন অর্চনা গুহ মামলা। ভারতীয় উপমহাদেশে পুলিশ বাড়ির পুরুষের খোঁজে এসে তাকে না পেলে নারীদের অসম্মান ও লাঞ্ছনা করে। অর্চনা গুহ-দের লাঞ্ছনা, মায়া ত্যাগীর লাঞ্ছনা এই ট্রাডিশনের শরিক। সম্প্রতি সোনি সোরির ওপর পুলিশি হেফাজতে চূড়ান্ত যৌন নির্যাতন বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অথচ সাম্প্রতিক আইনেও রাষ্ট্র এ বিষয়ে নীরব। ভার্মা কমিশনের সুপারিশ, সাধারণ বিচারালয়ে এদের বিচার। কিন্তু সরকার এ ন্যূনতম পদক্ষেপটুকুকেও স্বীকৃতি দেন নি।

এর পর বলি উত্তরপ্রদেশের মুজঃফরনগরের চর থাওল গ্রামের মুসলিম গৃহবধূ ইমরানার কথা, যাকে তার শ্বশুর আলি মহম্মদ ধর্ষণ করে। গ্রামের জাতি পঞ্চায়েত (আনসারী) রায় দেয়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্বশুরের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে যখন তখন স্বামীর সাথে তার বিয়ে খারিজ হয়ে গিয়েছে। ইমরানাকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হলে শ্বশুরকে স্বামী বলে মেনে নিতে হবে। আর তার পাঁচ সন্তানের জনক নূর ইলাহিকে সন্তান মনে করতে হবে। ইমরানার মত— সে শ্বশুরকে জেলে পাঠাতে চায়— মেনে নেওয়া হয় না। ক্রমশ পরিবার, পঞ্চায়েত ও ধর্মীয় বিধান সবই ইমরানার বিরুদ্ধে যায়। শরিয়ত আদালতও এই বিধানই মেনে নেয়। ইমরানাও এই বিষয়টি শেষাবধি মেনে নেয় কিন্তু শ্বশুরের কঠোরতম শাস্তি দাবি করে। পরবর্তীতে ইমরানা এসব কথা জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান গিরিজা ব্যাসের কাছে বলে। ইমরানা ও তার স্বামী শ্বশুরের জামিনের বিরোধিতা করে।

ইমরানার এই ঘটনার প্রচার ছড়িয়ে পড়ায় এই ধরনের আরো অবিচার সামনে এসেছে। এর চার বছর আগে উত্তরপ্রদেশেই রাণী বেগমের ইমরানার মত দশা হয়। কাতিলো গ্রামের লতিফুন্নেসা তালাকের পর স্বামীর কাছে আবার ফেরার জন্য অন্য পুরুষের সাথে নিকাহ্ করতে অস্বীকার করেন। জ্যোৎস্না আরারও একই ঘটনা। মধ্যপ্রদেশের পাহাড়গড়ের হরিশচন্দ্র ঢাকার তার পুত্রবধূকে ধর্ষণ করে পলাতক হন। অথচ এসবের বিরুদ্ধে কোনো সরকারি পদক্ষেপ বা জোরদার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

মুম্বাইয়ে বিশ্বায়ন বিরোধী মঞ্চ 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম' সম্মেলনে আসা দক্ষিণ আফ্রিকার এক এইড্স কর্মী দক্ষিণ আফ্রিকারই এক কোর্টের বিচারপতি সিরাজুদ্দিন মোহম্মদ ইব্রাহিম দেশাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনে। বিচারপতি দেশাই গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর জামিন হয় না। এর পরে উইনি ম্যান্ডেলার হস্তক্ষেপে মেয়েটি অভিযোগ তুলে নেয়। কিন্তু মেয়েটিকে নিজের দেশ বা ভারতের কারোর সাথে কথা বলতে দেওয়া হয় না। বিচারপতি দেশাই মুক্তি পান, বলা হয়— এটি ধর্ষণের ঘটনা নয়, দুজনের সম্মতিতেই সহবাস হয়েছে। অভিযোগকারী অভিযোগ তুলে নিয়েছেন, সুতরাং ধর্ষণের অভিযোগটি মিথ্যে।

রাজস্থানের ভাঁওরি দেবীর ক্ষেত্রেও উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্গের নারীকে ধর্ষণ করে না— এ 'যুক্তি' দিয়ে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

সবশেষে উল্লেখ করা যাক মথুরা ধর্ষণকাণ্ডের প্রেক্ষিত। ১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রে মথুরা নামে এক দলিত অল্পবয়সী মেয়ে ধর্ষিতা হয় থানার মধ্যে পুলিশের হেফাজতে। দুই কনস্টেবল মেয়েটিকে ধর্ষণ করে যখন বাইরে উপস্থিত ছিল মেয়েটির পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় হাইকোর্ট ধর্ষকদের ৭ বছরের সাজা দিলেও সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনাকে ধর্ষণ বলে মানতে অস্বীকার করে। কারণ, মেয়েটির চিৎকার বাইরে থেকে শোনা যায়নি অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় মেয়েটির সম্মতিতে যৌন সংসর্গ হয়েছিল। তাই বলে দেওয়া হয়, মেয়েটির চরিত্র ভালো ছিল না। এই রায় বেরোয় ১৯৮০ সালে।

কিন্তু ১৯৭৭ থেকে দেশজোড়া যে ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন চলে, তার ব্যাপ্তি বর্তমান ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের চেয়ে বেশি ছিল। তার ফলে সরকার ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনে কিছু সংশোধনী আনতে বাধ্য হয়। এখানে যে বিষয়গুলিতে আলোচনা হয়েছিল, তা হল— (১) ধর্ষণের সংজ্ঞা; (২) ধর্ষিতার পরিচয় গোপন রাখা, প্রকাশ করলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ; (৩) পুলিশী হেফাজত, জেল বা হোমে থাকাকালীন ধর্ষণের অভিযোগ আনলে তা তৎক্ষণাৎ নথিভুক্ত করা হবে এবং অভিযোগকারীর বয়ানকেই প্রামাণ্য হিসেবে ধরা হবে; অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে যে নিরপরাধ; (৫) থানা ধর্ষণের বয়ান নথিভুক্ত করতে না চাইলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ; (৬) গণধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ হবে জামিন-অযোগ্য।

আমাদের সমাজে আইনি অধিকারের সীমাবদ্ধতা

নারীর ওপর অত্যাচার-অবমাননা-হেনস্থার প্রশ্নে নানা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যেটুকু অধিকার অর্জিত হয়েছে তার ফলিত প্রয়োগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রথমত পুলিশ-প্রশাসন ও আদালত অবধি পৌঁছতেই পারে না মেয়েরা। সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে আদালত অবধি কেস ওঠাতেই অনেক লড়াই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অত্যাচারিতা বা ধর্ষিতার প্রতি মনোভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে অত্যন্ত নেতিবাচক।

ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা চালায় রাষ্ট্র, তারাই দেয় আইনজীবী। ধর্ষণের অভিযোগ আনলে, তাতে মামলা শুধু হয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির। এতে প্রথাগত নিয়ম রূপে নারীর সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটা দায় নেয় বটে কিন্তু মামলার গতিপ্রকৃতির জন্য ধর্ষিতাকে রাষ্ট্রের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়। মামলার দীর্ঘসূত্রতা অভিযোগকারিণীর মনের জোর কমিয়ে দেয়।

মহিলা পুলিশ, মহিলা বিচারক মানেই তারা পুরুষতান্ত্রিক সংস্কার মুক্ত, নারীর প্রতিসংবেদনশীল হবেন— এমনটা নয়। উপরন্তু তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশ। ফলে ধর্ষিতা এতে সবসময় বিশেষ সুবিধা পান না। তদন্ত কমিশনগুলির সুপারিশ সরকারি

তরফে কার্যকর করার কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। সাম্প্রতিক ধর্ষণ আইনের ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও ভার্মা কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে কোনো আলোচনাও করা হয়নি। তাই পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদর্শন ও নারীর ওপর যৌনহিংসা একইভাবে সমাজে বলবৎ থেকে যায়।

নারীর বিরুদ্ধে হিংসার প্রতিবাদে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক নানা নারী সংগঠনগুলি আইনের ওপর জোর দিয়েছে। ধর্ষণ-বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলনে তাই বারবার বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন হয়েছে। কিন্তু শুধু আজকের ভার্মা কমিশনই নয়, কোনোদিন-ই এই ধরনের তদন্ত কমিশনের সুপারিশ সরকারের তরফে কার্যকর করার প্রয়াস বিশেষ নজরে পড়ে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করা হয় না। বরং জনগণের ক্ষোভকে প্রশমিত করার একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে এই ধরনের নানা কমিশন।

'ভার্মা কমিশন' -পরবর্তী অর্ডিন্যান্স

ভার্মা কমিশন রিপোর্ট ২৯ দিনের মাথায় জমা পড়ার পরপরই কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি একটি অর্ডিন্যান্স পাশ করে, যেখানে 'ভার্মা কমিশন'-এর সুপারিশগুলির অনেক কিছুই গৃহীত হল না। বেশ কিছু নারী সংগঠন আবেদন করেছিল—

> We are alarmed at the complete lack of transparency shown by the government... we call upon the President not to sign such an Ordinance.

আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার মন্তব্য করেন :

> An Ordinance like this, implemented by stealth, serves to weaken our democracy. It betrays the trust of thousands of men and women who marched on the streets at Delhi and other cities, demanding an end to impunity for sexual violence.

তা সত্ত্বেও কোনও আলাপ-আলোচনা ছাড়াই ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ অর্ডিন্যান্স পেশ করা হলে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তাতে স্বাক্ষর দান করেন।

এই নতুন অর্ডিন্যান্স কিছু নতুন ধরনের অপরাধ চিহ্নিত করলো। এর মধ্যে কিছু অপরাধকে নিম্নলিখিত আইনের ধারাগুলোতে বিচার করা হলো— অ্যাসিড দিয়ে আক্রমণ, যৌনহেনস্থা, নারী শরীরকে লুকিয়ে দেখা, তাকে গোপনে অনুসরণ করা, তাকে যৌনপণ্য হিসেবে দেখা ইত্যাদি।

ক) অ্যাসিড ছুঁড়ে আক্রমণকে বিচার করা হল ৩২৬(এ) ধারায়। এতে ১০ বছরের কম কারাদণ্ড হবে না— প্রয়োজনে যাবজ্জীবনও হতে পারে। সাথে জরিমানাও হতে পারে — ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

খ) অ্যাসিড ছুঁড়ে আক্রমণের প্রচেষ্টা— ৩২৬(বি) ধারায় একে বিচার করা হল। এতে ৫ বছরের কম কারাদণ্ড হবে না। তা বেড়ে সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

গ) যৌন হেনস্থা— ৫ বছর পর্যন্ত কঠোর কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা দুটো-ই। এই বিচারটি প্রযোজ্য দুটি ক্ষেত্রে— শরীরী স্পর্শ এবং অবাঞ্ছিত ও খোলাখুলিভাবে কেউ এগোলে এবং যৌন সুখানুভূতির জন্য কেউ দাবি বা অনুরোধ করলে।

আর এক বছরের জেল, জরিমানা বা দুটোই প্রযোজ্য হবে যেসকল ক্ষেত্রে, তা হলো— যৌনগন্ধী মন্তব্য করা, জোর করে পর্নোগ্রাফি দেখানো বা অন্য যে কোনো দৈহিক, বাচনিক বা অ-বাচনিক যৌন প্রকৃতির আচরণের জন্য।

৩২৬এ, ৩২৬বি এবং ৩৫৪এ— এই ধারাগুলিকে লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হয়েছে।

ঘ) জনসমক্ষে নারীর বস্ত্রহরণ করলে— ৩৫৪ (বি) ধারায় বিষয়টি বিচার করা হয়েছে। অন্তত ৩ বছরের কারাদণ্ড, তা ৭ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে, জরিমানাও হতে পারে।

এখানে বিবেচ্য মেয়েদের হেনস্থা করা, অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করা, সামাজিক পরিসরে মেয়েদের নগ্ন হতে বাধ্য করা বা বস্ত্রহরণ করা।

ঙ) নারীকে গোপনে দেখা— ৩৫৪ (সি) ধারায় একে বিচার করা হয়েছে। প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে এক বছরের কম কারাদণ্ড হবে, তা ৩ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, জরিমানাও হতে পারে। দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী ক্ষেত্রে ৩ বছরের কম কারাদণ্ড নয়, যা ৭ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

যদি মেয়েদের ব্যক্তিগত পরিসরে তাদের লুকিয়ে দেখা বা ছবি তোলা হয়, যেখানে মেয়েরা নগ্ন, জামার বোতাম খোলা বা বুক উন্মোচিত করে রাখে বা শুধু ব্রেসিয়ার দিয়ে ঢাকা থাকে তা দেখে, অথবা কোনো ব্যক্তি, সামাজিক পরিসরে করা যায় না এমন কোনো যৌন ক্রিয়া করে, তার জন্য তাদের শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে।

চ) মেয়েদের গোপনে অনুসরণ করা বা পণ্যবস্তু রূপে দেখা— এর জন্যে অন্তত এক বছরের কারাদণ্ড, তা ৩ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

ভার্মা কমিশনের সুপারিশ মূলত গেল 'হিমঘরে', তাকে প্রায় কার্যকর করা হলো না। এই কেন্দ্রীয় সরকারের সংবেদনশীলতার অভাব নতুন কিছু নয়। খোদ রাজধানী থেকে দেশের সর্বত্র ধর্ষণ ও নারী নিগ্রহের ঘটনা অধিকাংশই সুবিচার পায় না। কিছু একটা করতে হবে— এই চাপে তারা তড়িঘড়ি একটা অর্ডিন্যান্স পাশ করালেন। নানা প্রতিবাদের মুখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদিও জানিয়েছিলেন এই অর্ডিন্যান্স চূড়ান্ত নয়। আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তা চূড়ান্ত করা হবে। কিন্তু অর্ডিন্যান্স মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। অর্ডিন্যান্সের প্রণয়ণ সরকার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক তুলে নিয়ে এল—

১) ভার্মা কমিশন চেয়েছিল, নারী বিষয়ক অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে। কারণ তথ্য বলছে, নারীঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত অনেক প্রতিনিধি এই মুহূর্তে নানা আইনসভা আলো করে বসে আছেন, লোকসভাও ব্যতিক্রম নয়। অনেক অপরাধের মতো নারী বিষয়ক অপরাধের সাথে যে ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সাঁট থাকে— কমিশনের চেয়েছিলেন তাকে বিচ্ছিন্ন করতে। কিন্তু এ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার মুখে কুলুপ আঁটলেন।

২) ক্ষমতার অন্য একটা প্রান্ত নিয়েও কথা বলেছিলেন ভার্মা কমিশন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (AFSPA)-কে সামনে রেখে, সাধারণ নারীদের ওপর সেনাবাহিনী যেভাবে সাধারণ নির্যাতন সহ যৌন নির্যাতন চালায়— তার চেহারা ভয়ংকর। অপপ্রয়োগের নিরিখে এই বিশেষ আইনের অবলুপ্তি শুধু নয়, ভার্মা কমিশন প্রস্তাব করেছিলেন, যেসব জওয়ান নারী-নিগ্রহে অভিযুক্ত হবেন, দেশের সাধারণ ফৌজদারি আইনে তার বিচার করা হোক। এতে সাধারণ মানুষের মনে একটা 'আস্থা' ফেরানো যাবে। অর্ডিন্যান্সে এই নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করা হয়নি— ব্যাপারটি সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত এই দুটি সমালোচনা অর্ডিন্যান্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে খুব গুরুত্ব নিয়ে উঠে এল।

ক্রিমিন্যাল ল' সংশোধনী বিল, ২০১৩

১৯ মার্চ ২০১৩ এই বিল পাশ হল লোকসভায়। আর রাজ্যসভায় ২১ মার্চ। যা IPC, IEC, Code of Criminal Procedure 1973 (যার মধ্যে যৌন সংক্রান্ত আইনও পড়ে), এগুলোর সংশোধন নিয়ে এল। ভার্মা কমিশনের ৯০ শতাংশই অর্ডিন্যান্সে গ্রহণ করা হয়েছে বলে আইনমন্ত্রী অশ্বিনী কুমারের দাবি ছিল মিথ্যা। আবার অর্ডিন্যান্স নিয়ে এত বিতর্কের পরও কোনো রকম আলোচনা ব্যতিরেকে নতুন ধর্ষণ আইন পাকা করে ফেলা হলো। অর্ডিন্যান্সের সুপারিশগুলো ছাড়াও এই আইনে যে নতুন পরিবর্তনগুলো এলো তা মূলত এই—

ক) IPC-র ৩৭০ ধারা পরিবর্তিত হলো ৩৭০ এবং ৩৭০(এ) ধারায়। যদি একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়, স্থানান্তরিত করা হত হয়, লুকিয়ে রাখা হয়, বদলি করা হয় বা হুমকি, গায়ের জোর, জবরদস্তি, অপহরণ, প্রতারণা বা প্রলোভিত করা হয় এবং ক্ষমতার দ্বারা হেনস্থা করা হয় অথবা শোষণ করা হয়, পতিতালয় বা দাসত্বে জোর করে আনা হয়, জোর করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়— তাহলে অপরাধীর ন্যূনতম ৭ বছর জেল হবে। অপরাধী সারা জীবনে কতজনের পাচারের সাথে যুক্ত আছে তার ওপর শাস্তির পরিমাণ স্থির হবে।

খ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধর্ষণের সংজ্ঞার পরিবর্তন। ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণ শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে শ্লীলতাহানি দ্বারা এবং লিঙ্গ অনুপ্রবেশ ছাড়া অন্য অনুপ্রবেশকেও ধর্ষণ হিসেবে ধরা হয়েছে। সংজ্ঞাটিকে সে অর্থে পরিবর্ধিত করা হয়েছে। কিছু যৌনক্রিয়া যেমন— যোনি, মুখ, মূত্রাশয়, পায়ুতে লিঙ্গ অনুপ্রবেশ বা দেহের যে কোনো অঙ্গের অনুপ্রবেশ করা বা কাউকে দিয়ে করানো, শরীরের গোপন অংশগুলোতে মুখ বা যে কোনো কিছুর স্পর্শ— এগুলোকে যৌন হেনস্থার মধ্যে ধরা হয়েছে। এখানে 'অনুপ্রবেশ' বলতে যে কোনো পরিমাণ অনুপ্রবেশের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এবং শারীরিক প্রতিরোধের বিষয়টা এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে 'অপ্রাসঙ্গিক' বলা হয়েছে। কারাদণ্ড ৭ বছরের কম নয়, কিন্তু তা সারাজীবনের কারাদণ্ডও হতে পারে এবং জরিমানাও হতে পারে।

গ) ৩৭৬(এ) এই নতুন ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি যৌন হেনস্থায় যুক্ত হয় আর তার ফলে যদি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয় বা পঙ্গু হয়ে যায়, অপরাধীর ভয়ানক শাস্তি হবে। যা কুড়ি বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, এমনকী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারে।

ঘ) গণধর্ষণের ক্ষেত্রেও ভয়ানক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এতে ২০ বছরের কম কারাদণ্ড হবে না, যাবজ্জীবনও হতে পারে। ধর্ষিতকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পুনর্বাসন ও চিকিৎসার জন্য।

(১) *লিঙ্গ নিরপেক্ষতা*— এই সংশোধনী আইনে 'লিঙ্গ নিরপেক্ষতা' বজায় রাখতে বলা হয়েছে, 'The new law must be expanded to protect all persons and not to be limited to women- because all persons/anyone can be raped'। এই আইন পুরুষের বিরুদ্ধে নয় বরং এই আইন আমাদের বাবা-স্বামী-ভাই-সঙ্গী-প্রতিবেশী-সহকর্মী সকল পুরুষের জন্যও। এই আইন আসলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে। এই আইন যাবতীয় যৌন হিংসা— ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নগ্ন করে দেখা এবং নারীকে নগ্ন করে হাঁটানো ও তাকে লুকিয়ে দেখা— এই সমস্ত অপরাধ থেকে সমাজকে সুরক্ষিত করার জন্য। নারী-পুরুষ উভয়েই হেনস্থা হতে পারে। তাই ৩৭৫ এবং ৩৭৬(২) ধারায় ধর্ষিত সংজ্ঞা বদলে সেখানে 'person' কথাটি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। নারীও ধর্ষক হতে পারে— এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে হাজির করা হয়েছে।

এছাড়া কিছু পরিমাণে পরিবর্তন এসেছে CRPC এবং Evidence Act-এ। যেমন, ধর্ষিতার বয়ান রেকর্ড করা, ধর্ষিতার চরিত্রের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা, এবং ধর্ষিতার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ ব্যবহার করা।

ধর্ষণ আইনে কয়েকটি বিষয় নিয়ে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে—

ক) লিঙ্গ নিরপেক্ষতা:

ধর্ষণ হলো আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের ক্ষমতা

বিন্যাসের অসাম্যর প্রকাশ। সমাজে যেখানে সমতা অনুপস্থিত, সেখানে আইনে 'লিঙ্গ-সমতা'র ধারণা আসলে পুরুষের ক্ষমতার বিন্যাসকে শক্তিশালী করবে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতার অসাম্যের এই বিন্যাস পুলিশ-প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থাতেও রয়েছে। এবং নারীর প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক মনোভাবও বিরাজ করছে। প্রতিদিনকার ধর্ষণের অনেক অনেক ঘটনা এই সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সেখানে এই প্রসঙ্গে লিঙ্গ-সমতার কথা এক ধরনের বিদ্রূপ বলেই সমালোচকরা মনে করছেন।

সাধারণ পরিস্থিতি ছাড়াও যেখানে মেয়েরা ক্ষমতায় আছে, সেখানেও এই লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার ধারণা প্রয়োগ করার অর্থ, বিপরীত দিক থেকে নানা অভিযোগ আসতে থাকায় অভিযোগ-কারী মেয়েরা বাধ্য হবেন তাঁদের অভিযোগ তুলে নিতে।

(খ) *যৌনক্রিয়ার ন্যূনতম বয়স :*

১৯৮৩ পর্যন্ত ৩০ বছর ধরে ভারতবর্ষে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্মতিদানের ন্যূনতম বয়স ছিল ১৬ বছর। কিন্তু নানা মতামতের ভিত্তিতে Sexual Offence Act, May 2012-তে এর বয়ঃসীমা বাড়ানো হয়। ভার্মা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সম্মতিমূলক যৌন সম্পর্ক অপরাধী যুবকদের অপরাধপ্রবণতা কমাতে এই বয়স ১৬ করার প্রস্তাব আসে। আইনেও এটিই মেনে নেওয়া হয়েছে।

বয়স ১৬ বছর করার অর্থ এই নয় যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণের নারী-পুরুষকে যৌনক্রিয়ার জন্য সামাজিক বা নৈতিকভাবে কোনো অনুমোদন বা উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। এর অর্থ দুজন মানুষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করছে, তারা যৌনভাবে মিলিত হবে কি না; সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া— কিন্তু তাদের 'অপরাধী' রূপে বিচার করা বা জেল-গারদের দিকে ঠেলে দেওয়া নয়। 'age of consent' ১৬ বছর হওয়ার প্রকৃত অর্থ, একটি ছেলে যদি ১৬ বছরের নিচে কারো সাথে যৌন সংস্পর্শে আসে তবে তাকে বিধিসম্মত ধর্ষণ বলা হবে। আর যদি ১৮ বছর বয়স ধরা হয়, তার মানে ১৬-১৮ বছর বয়সী কারোর সঙ্গে যৌন সংসর্গে এলে তাদেরও বিধিবদ্ধ ধর্ষণের জন্য অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এই যৌন সম্পর্ক হলেও বিচারক বাধ্য হবেন এই সমস্ত ছেলেদের হোমে বা জেলে পাঠাতে। কিন্তু এক্ষেত্রে 'ধর্ষণ' হিসেবে অপরাধীকরণ হলে তা অল্পবয়সী ছেলেদের ভয়াবহভাবে অরক্ষিত করে তুলবে, বিশেষ করে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা ছেলেদের।

১৬ বছরের অবস্থান নেওয়ার আর একটি কারণ হলো ১৮ বছর বয়সকে সম্মতিদানের ন্যূনতম বয়স করলে তা ধর্ষণ বা যৌন হেনস্থার ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত সুরক্ষা নিয়ে আসবে না। এটা কেবল অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের জীবন ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করবে। তাদের পছন্দের অধিকার, যৌন সক্রিয়তা— এই মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করতে হলে আইনে ১৬ বছর বয়সকে যৌনক্রিয়ার সম্মতির বয়স হিসাবে ধরাই বাঞ্ছনায়।

বিবাহের বয়স অবশ্য ১৮ বছর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতা, যার ফলে সারাজীবন ধরে নানা দীর্ঘকালীন দায়িত্বপালন করা হয়।

পাচার এবং জোর করে দেহব্যবসা করানোর ক্ষেত্রে ১৬-১৮ শুধু নয়, কোনো বয়সের শিশুকন্যা ও নারীরই অনুমোদন থাকে না। তাই এখানে বয়সের ব্যাপারটা পুরোটাই অপ্রাসঙ্গিক।

অর্ডিন্যান্সে ১৮ বছর বয়সকে সম্মতি হিসেবে তুলে ধরা হলেও আইনে ১৬-১৮-র মধ্যে রাখা হয়েছে এবং দুজনের বয়সের ব্যবধান ৪ বছরের বেশি হওয়া উচিত নয় বলে মনে করা হয়েছে।

(গ) বিবাহিত জীবনের ধর্ষণ :

নতুন আইনে বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রেও ধর্ষণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি অবশ্যই একটি প্রগতির চিহ্ন।

শেষের কথা

এই ভাবে নানা প্রতিবাদের চাপে বর্তমান ধর্ষণ বিরোধী আইনে সামান্য কিছু প্রগতিশীল বিষয়কে ধরা হল। তবু বলা যেতে পারে, আইন প্রয়োগের যে ইতিহাস আমরা আগে দেখেছি এবং প্রতিদিন দেখছি তা আমাদের আশঙ্কিত করে যে এবারের আইনের সুযোগও মেয়েরা বাস্তবত পাবে না।

শুধু তাই নয়, সমাজ সংস্কৃতি জুড়ে, দৈনন্দিন জীবনে-মননে, রাষ্ট্র ও তার ব্যবস্থাপনায় যতদিন পুরুষতন্ত্র গেঁড়ে বসে থাকবে, আইনের সুযোগ যেমন সবাই পাবে না, পাশাপাশি আইনও পুরোপুরি নারীস্বার্থবাহী, নারীর শোষণ লাঞ্ছনার প্রতিকারের উপায় হয়ে উঠতে পারবে না।

নারীকে যৌন বস্তু রূপে দেখার, তাকে প্রদর্শন ও ভোগের বস্তু রূপে দেখার মানসিকতা, তাকে কেনাবেনার বস্তু রূপে দেখার মানসিকতা সমাজে রমরমিয়ে বিরাজ করবে আর আইন নারীকে সম্মান ও সুরক্ষা দেবে, এদুটো পাশাপাশি চলতে পারে না।

তাছাড়া ধর্ষণকে শুধু যৌনতার অংশ হিসেবে দেখলে চলবে না, একে এক রাজনীতি, আধিপত্য ও ক্ষমতার আধার রূপে দেখতে হবে।

আজ দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদরা ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, অথচ তারাই নারীর ওপর একপেশেভাবে সতীত্বের ধারণা চাপিয়ে দিয়ে নারীর এগোনোর পথে বাধা তৈরি করে। তাছাড়া, অনেকের মতে, মৃত্যুদণ্ড বাড়লে ধর্ষিতাকে মেরে ফেলার ঘটনা একই হারে বেড়ে যাবে। আর মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করার দাবিও জোরালো।

কাজেই ধর্ষণের প্রতিকার চাইলে পুরুষতন্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক আচরণ, পণ্যসংস্কৃতি, ধর্ষণের সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই গড়ে তুলতে হবে। শুধু তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও কিছু দাবি-দাওয়া উত্থাপন করলেই সার্বিকভাবে সমস্যাটিকে নির্মূল করার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

প্রবন্ধ

জলপাই-ডুয়ার্সের বনবাসীরা ঃ একটি প্রাথমিক ধারণা

সুমন গোস্বামী

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির জঙ্গলমহলকে অনেকেই ডুয়ার্স নামে অভিহিত করেন। যদিও ব্রিটিশ ডুয়ার্স বলে চিহ্নিত করেছিল ভুটান সংলগ্ন বাংলা ও অসম-উভয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলকেই। ভুটানে প্রবেশের আঠারোটি দুয়ার-এর অঞ্চল হিসেবেই এই ডুয়ার্স নামকরণ। অসম অংশে ছিল এগারোটি দুয়ার এবং বাংলা অংশে সাতটি। বাংলা ও অসম অংশকে ব্রিটিশ ইস্টার্ন ডুয়ার্স এবং ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স- এই দুই অংশে ভাগ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেকদিন ধরেই ইস্টার্ন ডুয়ার্স, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকাটিকেই ডুয়ার্স নামে চিনে আসছেন সবাই। আমরা বরং একে জলপাই-ডুয়ার্স নামে ডাকব।

তো এই জলপাই-ডুয়ার্সের বনাঞ্চলের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে দলে-দলে পর্যটক ভিড় জমান পর্যটন মরশুমে। খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, জঙ্গল আর সিঞ্চুলা পাহাড়ের গর্বিত সিল্যুয়েট তাদের স্বাগত জানায়। এছাড়া ডুয়ার্স বলতে মানুষ বোঝেন রেলের ধাক্কায় হাতি-মৃত্যু এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভ-এ বাঘের থাকা-না-থাকার কিম্ভুত রহস্য। কিন্তু এসব ছাড়াও ডুয়ার্সের আরও কিছু আছে। আমরা তাকে অন্য ডুয়ার্স বলে অভিহিত করতে পারি। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে এখানে আছে ছোট ছোট কিছু বনগ্রাম। সেখানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা এই অঞ্চলে আছেন বহুদিন ধরে। স্বাধীনতার আগে, ব্রিটিশ আসার আগে, কোচ-রাজত্বেরও আগে, অ-নে-ক আগে থেকে তাঁরা আছেন। তাঁরাই এই ডুয়ার্সের মাটিকে স্বীয় মাটি বলার যথার্থ হকদার। কিন্তু সেই রাভা, গারো, মেচ, টোটো, ডুকপা, মঙ্গর, লিম্বু জনজাতির মানুষদের জীবনটি কিঞ্চিৎ অন্যরকম। যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (এমনকি গণতন্ত্রের ভড়ং করা রাষ্ট্রও) তার নাগরিকদের মূল কয়েকটি অধিকার দেয়। তার প্রথমটি হল জীবনের অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার। কিন্তু জলপাই-ডুয়ার্সের প্রাচীন জনজাতির মানুষদের সম্ভবত সেই অধিকারটুকুও নেই। যখন-তখন, যাকে খুশি গুলি করার অলিখিত স্বাধীনতা পেয়ে বনদপ্তর এখানে জঙ্গলরাজ চালায়।

আমাদের (অর্থাৎ শহুরে মধ্যবিত্তদের) অনেক কিছু নিয়েই একটা অস্বচ্ছ ও ধোঁয়াটে ধারণা আছে। কিন্তু সেটাকেই আমরা মান্যতা দিয়ে ফেলি অজান্তেই। এই যেমন, বন ধ্বংস করে বনের মানুষেরাই— এটা আমাদের ধারণা। এই ধারণা সৃষ্টিতে বনবিভাগের দায় প্রায় সম্পূর্ণত এবং তাতে নিত্য ধুয়ো দিয়েছে মিডিয়া। দীর্ঘকালের এই অনুশীলনে তাই আমাদের একাংশের ধারণা, জঙ্গলের বনবস্তির মানুষ মাত্রেই 'কাঠচোর' এবং আরও ভয়ঙ্কর— ফলত তাকে গুলি করে মারা যায়! প্রশ্ন হল এভাবে মানুষ মারার অধিকার কি বনকর্মীদের আছে? না, নেই। বনকর্মী কেন, কারওরই নেই। রাষ্ট্র নিজস্ব পদ্ধতিতে জেনে শুনে হত্যা করে আইনের সিলমোহর লাগিয়ে দেয় কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার সময়। আর বিরলের মধ্যে বিরলতাম অপরাধের ক্ষেত্রেই কেবল তার নজির আছে (যদিও সভ্য রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড আদৌ প্রচলিত থাকা উচিত কিনা সে নিয়ে প্রভূত বিতর্ক আছে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ ভিন্নতর।) পুলিশ কর্তৃক তথাকথিত 'সংঘর্ষ' দ্বারা হত্যার ক্ষেত্রেও মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ হল কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করার। সেক্ষেত্রে আদালতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককেই প্রমাণ করতে হবে যে, গুলিচালনা ভিন্ন অন্য কোনও পথ ছিল না। যদিও আমরা জানি, এই পোড়া দেশে সবথেকে বেশি আইন ভাঙ্গে আইনের রক্ষকেরাই। তবুও, অন্তত কাগজে-কলমে পুলিশ বাহিনীকে যথেচ্ছ গুলিচালনার অধিকার দেওয়া হয়নি। আর বনকর্মীরা হত্যা করলে? বনকর্মীদের হাতে যে বন্দুকটি থাকে, তা দেওয়া হয় বন্যপ্রাণীর থেকে আত্মরক্ষার জন্য। মানুষের মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক থেকে গুলি ছুটলে আইনের দৃষ্টিতে তা খুন এবং শুধুমাত্র খুন। অথচ, কেমন স্বচ্ছন্দে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়! কেউ কেউ বুক ফুলিয়ে গুলিচালনার কথা স্বীকারও করেন বটে!

'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় বিশ্বজিৎ রায় লিখছেন, ''...অধিকার সংগঠনগুলির দাবি অনুযায়ী গত দেড় দশকে অন্তত কুড়ি জন বনবস্তির মানুষ বনরক্ষীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই গরিব এবং রাজনৈতিক সুরক্ষাহীন আদিবাসী যুবা। বনমন্ত্রী হিতেন বর্মণ গুলিতে জীবনহানির কথা স্বীকার করলেও তাঁর দপ্তর বিশদ বিবরণে অসমর্থ। ২০০৭-০৮ থেকে আজ অবধি ১৩টি মৃত্যুর ঘটনা তাঁর দপ্তর থেকে স্বীকার করা হয়, যার মধ্যে ২০১১-১২ সালেই হয়েছে চারটি।'' (দ্য টেলিগ্রাফ ১৭/০৮/২০১২) অর্থাৎ, খুন হচ্ছে। অন্তত মন্ত্রী মহোদয় তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? অথবা, আদৌ হবে কি? মনে হয় না। মৃত মানুষগুলি যে সব অঞ্চলের এবং জনগোষ্ঠীর, তাদেরকে সভ্যতা বা সভ্য রাষ্ট্র 'এক্সপেন্ডেবল' বানিয়ে নিয়েছে। ফলত কিছু যায় আসে না।

কিছু তথ্য তুলে ধরা যাক।

পবনেশ্বরী রাভা হাসেন বড় মিষ্টি। উত্তর পোরো নামক রাভা গ্রামের এই যুবতী বাংলা বোঝেন, কিন্তু ভালো বলতে পারেন না। সেই না-বলা পুষিয়ে দেন হাসি দিয়ে। হাসিটি তাঁর মুখ থেকে

অদৃশ্য হতে দেখিনি। পবনেশ্বরীর বাঁ-পায়ে বেশ কিছু ছররা-র স্পিন্টার আছে। সেগুলি লেগেছে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে। তিনি এবং রাধা রাভা বিকেলে নদীতে জল আনতে গিয়েছিলেন। ঝোপের থেকে বনকর্মীরা বেরিয়ে আসে এবং কোনও কথা না বলে গুলি চালায়। পবনেশ্বরী ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। রাধার পায়েও গুলি লেগেছিল, কিন্তু তিনি কোনওমতে দৌড়ে গ্রামে এসে খবর দিতে সক্ষম হন। এরপর আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল... নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ... একমাস পর পবনেশ্বরী বাড়ি ফেরেন। নাঃ গুলির টুকরো বের করা হয়নি। এখনও সভ্যতার ধাতব নমুনা তাঁর শরীরে তিনি বহন করছেন। উপরি হিসেবে একটি সরকারি উপহার পেয়েছেন, তাঁকে মাসে মাসে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। পবনেশ্বরীর ভাষায়, 'কেস পড়ে'। কী কেস? কেন, কোন ধারার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে? পবনেশ্বরী এত কিছু জানেন না। তার ওই হাসিটিই সম্বল। যাক, সভ্যতা এখনও তাঁকে নিঃস্ব করতে পারেনি!

সত্যেন রাভা ও তাঁর বন্ধু ফিরন রাজাভাতখাওয়ার গারো বস্তির বাসিন্দা। ২০০৯-এর ৩০ নভেম্বর গবাদি পশুর খোঁজে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তিগুলির মানুষদের গবাদি পশু প্রতিদিন জঙ্গলে ঢোকে কিছু ভালো ঘাসের লোভে। সংসদীয় গণতন্ত্র তো তাঁদের আর কিছু দেয়নি, যা দিয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন! তো ফিরন এবং সত্যেন গিয়েছিলেন গরু খুঁজতে। সন্ধেবেলা। বনকর্মীরা হঠাৎ-ই দেখতে পায় তাঁদের এবং গুলি চালায় সত্যেনের মাথা লক্ষ্য করে। ছররা-র স্পিন্টার এখনও সত্যেনের মাথায়। তিনি চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছেন। হাঁটতে পারেন না, ভালোভাবে কথা বলতে পারেন না। তরতাজা এই যুবক ছিলেন পরিবারের ভরসা, এখন তিনি পরিবারের কাছে বোঝা মাত্র। প্রভূত আন্দোলনের সামনে পড়ে বনবিভাগ সামান্য কিছু খরচ দেয় চিকিৎসা বাবদ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করা হলেও আজ অবধি কেউ গ্রেপ্তার পর্যন্ত হয়নি। সত্যেনের পরিবারের লোক অবশ্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেন যে, তাঁদের ছেলেটি বেঁচে তো আছে।

এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বনকর্তাদের কথাবার্তা আরও ভয়ানক। কেউ কেউ জানান, ওরা ভয়ঙ্কর অপরাধী, কাঠচোর। (যেন কাঠচোরকে গুলি করে মারাটা বনকর্মীদের জন্মসিদ্ধ অধিকার!!) কেউ বা সোজা অস্বীকার করে বসেন। যেন কোনও ঘটনাই হয়নি। (অথচ স্বয়ং বনমন্ত্রী গুলিচালনায় মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।) এর পাশাপাশি একটা সারসত্য জানানো যাক। জলপাই-ডুয়ার্সের বনবস্তিগুলোতে যাঁদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে, তাঁরা জানেন— বনবিভাগ ওখানে সমান্তরাল প্রশাসন চালায়। কীট-পতঙ্গের থেকেও নিকৃষ্ট ব্যবহার করে বনবস্তির মানুষদের সঙ্গে (নতুন আইনে যাঁরা আসলে জঙ্গলের হকদার।) একজন সাধারণ রেঞ্জ অফিসারও ওখানে মুঘল যুগের সামন্ত। গুলিচালনায় হত্যার খবরটি তাও সংবাদমাধ্যমে আসে, দীর্ঘকালীন এই অসীম কদাচার চাপাই পড়ে থাকে, যা সকল রীতি-নীতি আইন-কানুন বিরোধী।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, গুলিচালনার ঘটনাগুলিতে কি আইনের দ্বারস্থ হওয়া যেত না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যেত এবং যায়, কিন্তু এখানে পরিপ্রেক্ষিতটা একটু আলাদা। এক তো প্রথমাবধি সভ্য জগৎ বনাঞ্চলের মানুষকে দূরে ঠেলে রেখে কোর্ট-পুলিশ-আইন ইত্যাকার বিষয়ে তাঁদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে

জলপাই ডুয়ার্সের জঙ্গলে বনকর্মীদের দ্বারা অবৈধ গুলিচালনার কয়েকটি ঘটনা

নাম	*বাসস্থান*	*তারিখ*	*সময়*	*ঘটনাস্থল*	*মৃত্যুকালে বয়স*
অগ্নি রাভা	উত্তর পোরো বনবস্তি	২৩/০৭/১৯৯৭	সন্ধে	জঙ্গল	২৮
সাধারণ রাভা	উত্তর পোরো বনবস্তি	২৫/০৩/১৯৯৮	বিকেল	৩১(সি) জাতীয় সড়ক	১৩
সুলেমান রাভা	দ. পোরো বনবস্তি	০৮/১২/২০০১	সন্ধে	৩১(সি) জাতীয় সড়ক	২৩
পুনিয়া রাভা	দ. পোরো বনবস্তি	২৪/০৯/২০০৮	সন্ধে ৭-৩০	জঙ্গল	৩৫
হ্রাদং রাভা	উত্তর পোরো বনবস্তি	২৮/০২/২০০৫	বিকেল	নদীর পাড়	৩৫
যোগেন রাভা	গদাধর বনবস্তি	জানা যায়নি	রাত্রি	জঙ্গল	...
স্যামুয়েল রাভা	উত্তর পোরো বনবস্তি	০৮/০২/২০০৮	সন্ধে ৬-৩০	জঙ্গল	১৫
সবুজ খেড়িয়া	নিউল্যান্ডস চা-বাগান	২৫/০১/২০০৯	বিকেল ছ'টা	জঙ্গল	১৬
সরধু চেরিয়া	মেন্দাবাড়ি	১৩/০৪/২০০৮	জানা যায়নি	জঙ্গল	...
সুরেশ রাভা	উত্তর পোরো বনবস্তি	১৩/১১/২০০৯	সন্ধে ছ'টা	জঙ্গল	২২
শ্যাম ওরাওঁ	খোকলুং বনবস্তি	০১/১০/২০১০	জানা যায়নি	নদীর পাড়	১৭
অনিল খেড়িয়া	হলদিবাড়ি চা-বাগান	২৮/০৪/২০১২	বিকেল	জঙ্গল	১৬

রেখেছে। নিজে থেকে থানায় গিয়ে অভিযোগ, তা-ও আবার বনকর্তাদের বিরুদ্ধে! এ কথা ভাবার থেকে বরং বনাঞ্চলের মানুষ হাতির সঙ্গে কুস্তি লড়তে রাজি। কয়েকটি ঘটনায় বিভিন্ন সমাজকর্মীদের সহায়তায় থানাতে অভিযোগ জমা পড়লেও স্থানীয় পুলিশ বিষয়গুলিকে পাত্তাই দিতে চায়নি। উলটে খুনির অভিযোগক্রমে নিহত ব্যক্তির (এবং তাঁর কাল্পনিক সঙ্গীদের) বিরুদ্ধে বনধ্বংসের মামলা করেছে। খুব জোর অত্যন্ত অনিচ্ছায় পুলিশ অনিচ্ছাকৃত হত্যার মামলা করে। অথচ, আইন বলে, এক্ষেত্রে খুনের মামলা করাটাই উচিত। ২০০৯ সালে নিউল্যান্ডস বাগানের সুরজ খেরিয়া হত্যার ঘটনাটিই সম্ভবত ডুয়ার্সের বনাঞ্চলের প্রথম ঘটনা, যেখানে পুলিশ সরাসরি খুনের মামলা করেছে (তবে এক্ষেত্রেও ফাঁক থেকেই গেছে, মামলাটি কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়নি, বনকর্মী নামক অনির্দিষ্ট শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে)।

এছাড়াও রয়েছে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলির খেলা। একটি হত্যার ঘটনা ঘটলেই রাজনৈতিক দলগুলির স্থানীয় নেতারা নিহতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি বনবিভাগের সঙ্গে আপসে মিটিয়ে (!) নেবার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি কখনও কখনও নির্দেশের আকারেও আসে। সাধারণত এক লক্ষ টাকায় মিটমাট (!) হলে পরিবার পায় ৫-১০ হাজার টাকা, বাকিটা সংশিষ্ট দলের স্থানীয় নেতার। ভালো বন্দোবস্ত যা হোক!

এই রকম পরিস্থিতিতে জলপাই-ডুয়ার্সের বনবাসী মানুষ এখন দুটো লড়াই লড়ছেন। একটি জীবনের অধিকারের জন্য লড়াই, বনবিভাগের যথেচ্ছ গুলিচালনার ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে এনে দোষীদের শাস্তির দাবিতে; অপরটি বনের ওপর নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের লড়াই, যা আইনে থাকলেও কার্যত অনুপস্থিত। এই সুযোগে আমরা একটু প্রাসঙ্গিক ইতিহাস দেখে নিতে পারি। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের বনাঞ্চলের মানুষের থেকে জলপাই-ডুয়ার্সের বনাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যলিপিটি আলাদা কিছু ছিল না। ব্রিটিশ আসার আগে অবধি কখনও কোচ রাজা, কখনও ভোট রাজার সৈন্যদের অত্যাচার সামলে-টামলে তাঁরা নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবন চালাতেন। জঙ্গল তাঁদের ঘর। সেখানকার মাটিতে ফসল, গাছে ফল। অসুখ হলে ওই জঙ্গলের ভেষজই প্রাণদায়ী। এসব তাঁরা চিনতেন, বুঝতেন ভালোভাবেই। এক অঞ্চলে তাড়া খেলে অন্য অঞ্চলে, খাবারের অসুবিধে হলে আবার অন্য কোথাও— এই ছিল জীবন। ব্রিটিশ এসে ব্যাপারটা পুরো গুলিয়ে দিল। তথাকথিত সভ্যতার প্রয়োজন এবং ভারতের বিশাল বনজ সম্পদকে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টায় তারা সৃষ্টি করল ভারতীয় বন বিভাগ (Forest Department, 1865) এবং বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে অত্যাচার চালানোর জন্য ভারতীয় বন আইন (Indian Forest Act, 1878)। এই বন আইনটি বিভিন্ন সময়ে আরও কড়া হয়েছে, নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, কখনও পরিবেশের নামে কখনও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নামে— এবং বনবাসী মানুষের জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে। যে জঙ্গলে বনবাসীরা থাকতেন এবং নিজেদের স্বার্থেই জঙ্গল রক্ষাও করতেন— সেই জঙ্গলই হয়ে উঠল সরকারি সম্পত্তি, বন-ঠিকাদারদের মুনাফাভূমি। বনবিভাগের কাছে জঙ্গল হল ব্যবসার জায়গা, ফলত তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে এবং ব্যবসাটি ঠিকঠাক ভাবে চালানোর জন্য ব্রিটিশ তিন ধরনের বন বসবাসভূমি সৃষ্টি করেছিল : বনবস্তি (Forest Village), ফিক্সড ডিমান্ড হোল্ডিং (Fixed Demand Holding) এবং টোঙ্গিয়া গাঁও (Tongia Village)। এদের মধ্যে ফিক্সড ডিমান্ড হোল্ডিং-গুলো চিহ্নিত ছিল বন ব্যবসাদারদের জন্য। কাঠ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ কেনা-বেচার লাইসেন্স যাঁরা পেতেন, তাঁদের হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হত এখানে। বদলে তাঁরা কিছু পরিমাণ রাজস্ব দিতেন। বনবস্তি বা টোঙ্গিয়া গাঁও-এর জীবন অত সুখকর ছিল না। যে সমস্ত বনবাসী মানুষকে এভাবে বসানো হয়েছিল, তাঁরা কোনও জমির মালিকানা স্বত্ব পেতেন না। কেবল চাষের সুযোগ ছিল। প্রাকৃতিক জঙ্গল সাফ করে অর্থকরী বৃক্ষ (শাল, সেগুন, ধুপী প্রভৃতি) রোপণ, জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণ— সবই করতে হত বনবস্তির মানুষদের। বদলে তাঁরা কোনও পয়সাও পেতেন না। বনবাসী মানুষদের এই দাস শ্রমিক দশা ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পরও ঘোচেনি। জলপাই-ডুয়ার্সের মানুষ মানুষের অধিকার ফিরে পাবার জন্য গত শতকের ছয়ের দশকের শেষ ভাগে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা জীবন হাতে নিয়ে কাজ করবার জন্য, সামান্য হলেও পয়সা পেতে শুরু করেন। নানা কারণে এই আন্দোলনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে এই ইতিহাসটি বৃহৎ বঙ্গে প্রায় অজানা থেকে গেছে। আসুন, আমরা আমাদের চলার পথে সামান্য কিছু জেনে-বুঝে নেবার চেষ্টা করি :

জলপাই-ডুয়ার্স নানা ভাষা ও জনজাতির এলাকা। বনবস্তিগুলোও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ষাটের দশক অবধিও এখানে বনবিভাগ-ই ছিল শেষ কথা বলা হকদার। প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হত বনবস্তির মানুষদের দিয়ে। কিন্তু বদলে গালিগালাজ বা মারধর ছাড়া কিছুই জুটত না। মনে রাখতে হবে, আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সেটি ব্রিটিশ যুগ নয়— ঘোরতর স্বাধীন গণতান্ত্রিক যুগ। কেন্দ্রে তখন কংগ্রেস সরকার, পশ্চিমবঙ্গের শাসন চালাচ্ছেন অ-কংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার। মার্চ মাসে নতুন জঙ্গল তৈরির জন্য ঝোপঝাড়ে আগুন লাগিয়ে এবং গোটা এলাকাটি পরিষ্কার করে তারপর বিছন ছড়ানোর দায়িত্বটি বনবস্তির মানুষদের। কিন্তু ১৯৬৮ সালে রাজাভাতখাওয়া অঞ্চলে অসময়ের বৃষ্টিতে সেই কাজ ব্যাহত হয়। বনবিভাগ হুমকি দেয়, সাতদিনের মধ্যে কাজ শেষ না হলে

বস্তির সকলকে উচ্ছেদ করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় আন্দোলন। বনবিভাগের জমিদারসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তিস্তা থেকে সংকোশ— গোটা জলপাই-ডুয়ার্সে। বেগার বিরোধী আন্দোলন নামে লোকমুখে খ্যাত এই আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা সবাই বনবস্তিরই মানুষ। প্রেমপ্রসাদ শর্মা (গৌতম বাজে নামে সমধিক পরিচিত), ইমানুয়েল কুজুর, কালীচরণ পাণ্ডে, সর্বসিং লামারা ছুটে বেড়িয়েছেন জলপাই-ডুয়ার্সের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিংবদন্তীপ্রতিম 'রায়বাবু' বা রমেশ রায়। পাশে পেয়েছিলেন হাসিমারা নিবাসী পঞ্জাব প্রদেশের মানুষ হরবন্ত সিং-কে। আন্দোলনকারীদের মূল নেতৃত্বের সবাই ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভাবিত সংগঠন নর্থবেঙ্গল ফরেস্ট ওয়ার্কার্স এন্ড জাগির কালটিভেটর ইউনিয়ন-এর হয়ে আন্দোলনটি পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে সংগঠনের নাম পাল্টে হয় ডুয়ার্স-তরাই ফরেস্ট ওয়ার্কার্স এন্ড জাগির কালটিভেটর ইউনিয়ন। যার সম্পাদক ছিলেন ইমানুয়েল কুজুর। গোটা জলপাই-ডুয়ার্স জুড়ে মিছিল করা হয়, বনবিভাগের বিভিন্ন অফিস এবং মহকুমা শাসকের দপ্তর ঘেরাও করা হয়। ডিভিশনাল কমিশনার-এর দপ্তরও অবরোধের মুখে পড়ে। বনবস্তির মানুষেরা জঙ্গলের কাজ করা থেকে বিরত থাকেন। দাবি একটাই, 'বেগার প্রথা' তুলে দিতে হবে। জঙ্গলে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হবে। আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক অত্যাচারও সীমা ছাড়ায়। ১৯৭১-এর ১০ জুন গোঁসাইহাট অঞ্চলে বনবাসীদের মিছিলে বনদপ্তর ও সিআরপিএফ মিলিতভাবে গুলি চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করে। নিহতরা ছিলেন; (১) আজমন রাভা, (২) জেঠা রাই, (৩) মোংরা ওঁরাও, (৪) সাধু ওঁরাও এবং (৫) চান্দু ওঁরাও। এর ফলে আন্দোলন স্তিমিত হবার বদলে তার তীব্রতা আরও বাড়ে। মিছিলে স্লোগান কেঁপে ওঠে সিঞ্চুলা পাহাড়ের ডলোমাইট স্তর। রাজ্য সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলে বনবাসীরা বনমন্ত্রী পরিমল মিত্র-র সঙ্গে কথা বলতে যান কলকাতায়। মন্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ-ও হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ এর মাঝামাঝি বেগার প্রথার বিলোপ ঘটে। আন্দোলনকারীরা দৈনিক ৩ টাকা হাজিরা দাবি করলেও প্রথমে মঞ্জুরীকৃত পারিশ্রমিক ছিল এরকম; পুরুষ—২.৬৩ টাকা, মহিলা—১.৬৩ টাকা, শিশু—১.২৫ টাকা। পরবর্তী সময়ে এই পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ইতিহাস পেছনে নিয়ে বক্সা বাঘবন, চিলাপাতা অরণ্য বা খুঁটিমারির জঙ্গলের রাভা, ওঁরাও, মঙ্গর, লিম্বুরা নতুন একটা লড়াই লড়ছেন। নিজেদের অধিকার বুঝে নেবার লড়াই। ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জারি করেছে নতুন এক ঐতিহাসিক আইন— The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006। আইনটি গোটা দেশে (জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া) লাগু হবার কথা ছিল ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে। কিন্তু তা কণামাত্র হয়নি। আইনে জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষকে জঙ্গলে বসবাসের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে বাসভূমি ও চাষযোগ্য জমি ভোগদখলের অধিকার, জঙ্গল থেকে কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণের অধিকার, সর্বোপরি কমিউনিটি ফরেস্ট রাইট বা জঙ্গলে গোষ্ঠীগত অধিকারটিতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গোষ্ঠী জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও অধিকার বনগ্রামবাসীদেরই। কিন্তু কায়েমি স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে এমন কাজকর্মে! বনদপ্তর এবং কাঠমাফিয়া, বনব্যবসায়ী এবং উচ্ছিষ্টভোজী মিডিয়া— একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে বনগ্রামবাসীরা তাঁদের অধিকার চাইতে গেলে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন, সম্পূর্ণ বে-আইনিভাবে প্রশাসনিক কর্তাদের আইনের নিয়ামক রূপে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে। বনবাসীরা প্রতিবাদ করলে মিথ্যা মামলার পাহাড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হচ্ছে।

তবু প্রতিবাদ চলছে, আন্দোলন চলছে। চিলাপাতা অরণ্যে মন্থরাম বনগ্রামের মানুষ জঙ্গল সাফ করে বেচে দেওয়ার বনবিভাগীয় রীতির প্রতি প্রতিস্পর্ধা ছুঁড়ে দিয়েছেন। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে মন্থরাম বিটে বনবিভাগের নির্দেশে যখন বাইরের লোকেরা জঙ্গল কাটাই করে গাড়ি বোঝাই করে কাঠ নিয়ে আসছিলেন, গ্রামবাসীরা তাদের বাধা দিয়ে সমস্ত কাঠ নামিয়ে রাখেন এবং কালচিনি থানায় বনবিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। পুলিশ বনগ্রামবাসীদের কথায় কান দেয়নি, উল্টে বনবিভাগের অভিযোগক্রমে গ্রামবাসীদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা শুরু করেছে। পাল্টা হিসেবে বনগ্রামবাসীরা উত্তরবঙ্গ বন-জন শ্রমজীবী মঞ্চের পক্ষে কনভেনশন করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা লড়াই ছাড়বেন না। 'অরণ্যের অধিকার' আইনে বনগ্রামবাসীদের জঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই অধিকার বুঝে নেবার পথে তাঁরা এখন থেকে উত্তরবঙ্গের কোনও অরণ্যেই বনবিভাগকে নির্বিবাদে গাছ কেটে সাফ করতে দেবেন না। বাধা দেবেন। যে জঙ্গল তাঁদের এতদিনের আশ্রয়, তাকে তাঁরা নষ্ট হতে দেবেন না। সর্দার মুলকি বিদ্রোহ (যার ফলে অর্জিত ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট), বীরসা মুণ্ডার সংগ্রাম, গাড়োয়াল-কুমায়ুন বনজীবীদের অধিকারের লড়াই এবং অবশ্যই জলপাই-ডুয়ার্সের বনবাসীদের বেগার বিরোধী লড়াই তাঁদের শক্তি, অনুপ্রেরণা।

অন্য ডুয়ার্সের মাটি এখন অন্য এক ইতিহাস লিখছে।

প্রবন্ধ

কোদানকুলম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আরও এক কু-রঙ্গ

সমরেশ মিত্র

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নের জন্য বড় বড় প্রকল্পের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এগুলো হলো 'উন্নয়নের মন্দির'। ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ প্রকল্প উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া গ্রামবাসীদের বলেছিলেন, সমষ্টির স্বার্থে গোষ্ঠী স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে এবং সমষ্টির উন্নয়ন হলে গোষ্ঠীর উন্নয়নও নিশ্চিত হবে। এর পর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে নর্মদা বাঁধ প্রকল্প নামক মেগা-পরিকল্পনা এসেছে— তিনটি প্রদেশের কয়েক হাজার গ্রামের অধিবাসীরা উচ্ছেদ হয়েছেন। এখানেও সেই সমষ্টির স্বার্থে গোষ্ঠী স্বার্থ জলাঞ্জলী দেওয়ার নিদান— 'গ্রেটার কমন গুড'!

বছর কুড়ি আগে গ্রেটার কমন গুড-এর গুঁতোয় নর্মদা পাড়ের কিছু অস্পৃশ্য দলিত উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন— হুজুর, সরকার মিথ্যে কথা বলছে। আপনারা দয়া করে নিরপেক্ষভাবে সত্যাসত্য বিচার করে সিদ্ধান্ত নিন। বাঁধ বানাতে গিয়ে মানুষের গ্রাম ডুবেছে, অথচ দেশের আইনমতে আগে তাদের পুনর্বাসন না দিয়ে গ্রাম জলমগ্ন করা যায় না। সরকার মিথ্যা বলেছে যে পুনর্বাসন সম্পূর্ণ হয়েছে। দিল্লির উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে গঠিত কমিটি সমীক্ষা করে জানায়, সরকারি দাবি ভুল— কোন পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়নি।

আদালতকে মিথ্যা বিবৃতির মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার জন্য আদালত কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেনি। বিচারপ্রার্থীরা যে যে বিষয়ে বিচার চেয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এড়িয়ে গিয়ে, ন্যায়ালয়ের মহামান্য বিচারকদ্বয় বড় বাঁধ আমাদের জন্য কেন প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধ খাড়া করেন। বলেন, বাঁধের ফলে উচ্ছেদ হলে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের লাভ। কেননা বাঁধের ফলে দেশের লাভ, গ্রেটার কমন গুড!

দু দশক পরে উচ্চ ন্যায়ালয়ের কুশীলবদের পরিবর্তন হলেও রাম-রহিমরা যে-কে-সেই। কোদানকুলম নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রটি যে প্রতি পদে দেশের আইন ভঙ্গ করছে, তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দিয়ে একদল উচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন ক'রে এই সম্পূর্ণ বেআইনি, সংবিধান লঙ্ঘনকারী প্রকল্পের বিরুদ্ধে সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রার্থনা করেন।

তাদের আবেদনে কী ছিলো তা বিচারের আগে মেট্রোপলিটান ইন্ডিয়ার মানচিত্রে ভারতের প্রান্তিক জনগণ যেখানে বাস করছেন তার একটা ভাসাভাসা ধারণা দেওয়া যাক। তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণ সাগরবেলাভূমি বরাবর তিরুনেলভেলি জেলার অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম কোদানকুলম। এই গ্রামে প্রায় ২৫০০ পরিবারের বাস, যার মধ্যে হাজারটি পরিবার দলিত। লাগোয়া গ্রাম ইদিনথাকারাই, এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের সবচেয়ে কাছের গ্রামগুলির অন্যতম। কোদানকুলমের মানুষের হাতে কাজ নেই, ৮০ শতাংশ দিন আনে দিন খায়। ইদিনথাকারাই গ্রামে ৬০ শতাংশ মানুষ মাছ ধরেন। কোদানকুলমে বেশিরভাগ বাড়ির সংসার চলে বাড়ির মেয়েদের বিড়ি বাঁধার মজুরিতে। সব মিলিয়ে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৪০ হাজার মানুষ এই নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের ধারেকাছে বসবাস করে। এদের ভাগ্য নির্ধারণ করছে কেন্দ্রের প্রায় সাড়ে পাঁচশো সাংসদ, রাজ্যের শ' তিনেক বিধায়ক আর কয়েকগণ্ডা মাননীয় বিচারপতি!

আবেদনকারীরা যা চেয়েছিলেন আর যা বিচার পেলেন

আলোচনার শুরুতে আমরা অকারণ ২০ বছর আগের নর্মদা মামলার কথা আনিনি। বর্তমান মামলার বিচারপতি রায় ঘোষণার সময় বার বার নর্মদা মামলার রায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে উদ্ধৃতিটি তাঁদের অতি প্রিয় উদ্ধৃতি বলে প্রতিভাত হয়েছে, সেটি এই রকম:

> গণতন্ত্রে একটি ছোটো গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের পরিবর্তে পুরো সমাজের জন্য কল্যাণের পদক্ষেপ নেওয়াই যে কোনো দায়িত্বশীল সরকারের মূল কাজ।

এই ভিত্তিভূমির ওপরে দাঁড়িয়েই বিচারপতি এই মামলাটির বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অতএব তাঁর কাছে সরকারের যাবতীয় ঘোষণা, যাবতীয় বিবৃতি, যাবতীয় বেআইনি কার্যকলাপ বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে। তাই সেই সব কাজ যতই সংবিধান-বিরোধী হোক না কেন, তার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই রাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছোটো গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টির তিনটি অংশ। প্রস্তাবনা অংশটিকে নিউক্লিয়ার শক্তির গুণগান বর্ণনা ছাড়া আর কী আছে তা বলা কঠিন। এই অংশটি নির্মিত হয়েছে আবার ভারতের পরমাণু মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রচারপুস্তিকা থেকে ধার করা তথ্যের ভিত্তিতে। এই অংশের ছত্রে ছত্রে তথ্যপ্রমাদ, ভুল বিজ্ঞান এবং কল্পবিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সহাবস্থান। তথ্য গোপন আসলে মিথ্যা ভাষণ। যে মিথ্যাভাষণের বিরুদ্ধে মামলার আয়োজন, ন্যায়াধীশবৃন্দ নিজেরাই যদি সত্য গোপন, অর্ধ-সত্য প্রচার এবং

সরাসরি মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় নেন, আবেদনকারীরা সেখানে কেমন ন্যায় বিচার পাবেন, তা সহজে অনুমেয়।

দু-চারটি উদাহরণ হয়ত এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রায়ের নবম পৃষ্ঠায়, প্রস্তাবনা অংশে উচ্চ ন্যায়ালয় মন্তব্য করেছেন, আমাদের দেশে গত ২০ বছরে নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের উৎপাদন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, বর্তমানে তা দেশের জাতীয় বিদ্যুৎ শক্তিচক্রে প্রায় ২.৫ শতাংশ বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেয়। এত সামান্য শতাংশ কেন জাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে আদালত আবার সেই নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশনের তথ্যই উদ্ধৃত করেছে। বলা হয়েছে, ২.৫ শতাংশ শক্তি উৎপাদন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঐ রায়েরই ১০ পৃষ্ঠায় আদালত মন্তব্য করেছে যে আমাদের দেশে নবীকরণযোগ্য শক্তি বিদ্যুৎ চক্রে যে ১৫ শতাংশ শক্তি সরবরাহ করে (যা নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের ৬ গুণ) তা "অতি সামান্য"! যে বায়ুশক্তির পক্ষে সারা দেশের শক্তি ও বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন সওয়াল করে আসছেন, এবং এই মামলার আবেদনকারীরাও বিকল্প হিসেবে সাগরবেলাভূমি জুড়ে বায়ু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের কথা বলছেন, আদালত সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং বাস্তব তথ্য উপেক্ষা করেছেন এবং এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কোদানকুলমের নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি নিজেই বায়ু-শক্তিকে ভরসা করতে বাধ্য হয়েছে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতর বেশ কয়েকটি বায়ু-শক্তি চালিত ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে! আদালত যে কেমন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে আদালত ঘোষণা করেছে, সারা পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রবণতা বাড়ছে। অথচ বাস্তব তথ্য বলছে যে সারা পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ নির্ভর দেশগুলোও (ফ্রান্স, জাপান, মার্কিন দেশ ইত্যাদি) তাদের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো নির্মাণ বন্ধ করে দিচ্ছে, একমাত্র ভারত, চীন এবং কোরিয়ায় এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে উৎপাদিত নানা বিদ্যুৎ শক্তির মধ্যে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা পরিমাণও কমে আসছে। আদালত কিন্তু এই সমস্ত বাস্তব এবং সুলভ তথ্য উপেক্ষা করে মিথ্যা ভাষণে দক্ষ নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন প্রদত্ত তথ্যের ওপরই নির্ভর করেছে। ফলে ন্যায় বিচার ধাক্কা খেয়েছে, প্রশ্ন উঠছে আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়েও।

নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে অপবিজ্ঞান, অবিজ্ঞান এবং কল্পবিজ্ঞানের অপূর্ব সহাবস্থানের পর রায়টি দুটি মুখ্য ভাগে আরও নানা বিষয় আলোচনা করেছে। প্রথম ভাগটিতে রয়েছে কোদানকুলম শক্তি-কেন্দ্রের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, এই কেন্দ্রের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা, তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরিবহন ও ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, উপকূল ব্যবস্থাপনার বিষয়, জল লবণমুক্ত করার প্রকল্প (যা এই শক্তি-কেন্দ্রের জলের যোগানের অন্যতম উৎস), তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব ইত্যাদি।

প্রথম পর্বের বিচারের পদ্ধতি শুধুই সীমাবদ্ধ থেকেছে সরকার যা করবে বলে ঘোষণা করেছে তার এক দীর্ঘ তালিকা প্রদানে। সরকার এযাবৎ যা করেছে বা যা এখনও করে চলেছে, আদালত কোনো অজ্ঞাত কারণে সে বিষয়ে নীরব থেকেছে। অথচ আবেদনকারীদের মূল অভিযোগ ছিলো যে, সরকার যা করবে বলে ঘোষণা করেছে আর যা করছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত। রায়টি প্রথমেই ধরে নিয়েছে যে, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ 'দূষণহীন বিদ্যুৎ', কারণ তা কার্বন-দহন জনিত গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে দেয় না। এই সিদ্ধান্ত টানার বিষয়ে আদালতের মূল ভিত্তি হলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ২০০৮ সালের একটি রিপোর্ট। স্বাধীন গবেষকরা, অর্থাৎ যারা কোম্পানির পয়সায় গবেষণা করেন না, পৃথিবীর বিভিন্ন মান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (যার মধ্যে হার্ভার্ড, এমআইটি প্রভৃতিও রয়েছে) গবেষকবৃন্দ সবাই এই রিপোর্টটিকে ভুলে ভরা অবৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বলে বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুত ২৪৭ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ রায়টির প্রায় ১১০ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়েছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিউক্লিয়ার বিষয়ক বিপদের বিরুদ্ধে কী কী সুরক্ষা লভ্য তার বিধি, আইন থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতেই। কিন্তু আদালত ভুলেও একবার কোদানকুলম-এর প্রেক্ষিতে এই বিধি ও নিয়মগুলি কী ভাবে রূপায়িত হচ্ছে সে বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

এইবার দেখা যাক, আবেদনকারীরা উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে কী কী বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চেয়েছিলেন এবং সে বিষয়ে আদালতের বর্তমান রায়ে কী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে।

আদালতের দ্বিচারিতা

১। এই আবেদনে আবেদনকারীরা কোদানকুলম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ফুকুসিমা-র দুর্ঘটনা ঘটার আগেই আবেদনকারীরা যেসব টেক্নিক্যাল বিচ্যুতির কথা তুলে ধরেছিলেন, রায় দেওয়ার সময় আদালত সেই সব বিচ্যুতির কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন নি। অথচ বর্তমান আবেদনটির মূল কথা ছিলো, এই সমস্ত বিচ্যুতির বিষয়ে নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশনের ক্রমাগত মিথ্যা ভাষণ করে চলেছে। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ২০০৫ সালে মার্কিন দেশের সঙ্গে ভারতের যে দ্বিপাক্ষিক ১২৩-নিউক্লিয়ার চুক্তি হয়, তার ফলে ভারতের নিউক্লিয়ার চুল্লিগুলিকে সামরিক কাজে এবং অসামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য পৃথক করা হয়। কথা ছিলো, অসামরিক নিউক্লিয়ার চুল্লিগুলির জন্য সামরিক

গোপনীয়তা থাকবে না এবং তা অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মতো সাধারণের এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নজরদারির আওতায় আসবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে, যেখানে নিউক্লিয়ার চুল্লির সামরিক এবং অসামরিক ব্যবহারের জন্য পৃথকীকরণ ঘটেছে, সেখানে সেখানে অসামরিক চুল্লিগুলি নিরপেক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নজরদারির আওতায় এসেছে। আইন এবং বিধি মতে ভারতেও এটিই হওয়ার কথা। কোদানকুলম চুল্লি অসামরিক নিউক্লিয়ার চুল্লি হিসেব চিহ্নিত, কিন্তু তা অন্যান্য যে কোনও সামরিক নিউক্লিয়ার চুল্লির মতো গোপনীয়তায় ভরা। আবেদনকারীর মতে সম্পূর্ণ বেআইনি এবং বিধিভঙ্গকারী এই কাজের বিরুদ্ধে প্রার্থনায় আদালত আশ্চর্যভাবে নীরব থেকে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন ভারতের পক্ষে অতীব জরুরি তার বর্ণনায় ৫০ পাতা ব্যয় করেছে।

২। আদালত ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড-এর যে দলিল থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে বলছেন যে কোদানকুলমে আদর্শমতে চলছে, সেই দলিলেই বলা আছে যে কোদানকুলম শক্তি-কেন্দ্রে মাঝে মাঝেই 'মিথ্যা' বিপদ সংকেত ঘোষণা করে স্থানীয় অধিবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপৎকালীন ব্যবস্থাটি পরখ করে দেখতে হবে এবং এই ব্যবস্থাকে সর্বদা সজাগ রাখতে হবে। তাছাড়াও আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে স্থানীয় মানুষদের জানান দেওয়ার ব্যবস্থা মাঝে মাঝে পরখ করতে হবে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত রাখতে হবে। এই দুই বিষয়েই সরকারের ব্যর্থতা প্রায় অপদার্থতার পর্যায়ে পড়ে। আবেদনকারীরা যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে কোদানকুলমে সতর্কতা প্রচার এবং দুর্ঘটনা-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুপস্থিত। আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার একবার এই বন্দোবস্ত করেছিল, যার পরিণতি ছিলো হাস্যকর। ৪০০০ জনকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩০ জন বসতে ও ১৫ জন দাঁড়াতে পারে এমন একটিমাত্র বাস জোগাড় করা হয়। বাসটি একবার যাতায়াতে সময় নিত ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে ৪০০০ জনের জন্য কত সময় লাগবে- প্রায় ২০০ ঘণ্টা অর্থাৎ এক সপ্তাহের কিছু বেশি- অথচ দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সময় পাওয়া যাবে বড় জোর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা! ভারতের নিয়ম, আন্তর্জাতিক বিধি ইত্যাদি বলছে, এটা করা যায় না। অথচ সবকিছু আইন মোতাবেক করা হয়েছে বলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন মিথ্যা হলফনামা পেশ করলে আদালত তা মেনে নিয়েছে। আদালত জানত যে হলফনামা মিথ্যা, তাই এই হলফনামাকে মান্যতা দিতে চাতুরির আশ্রয় নিয়ে, বিচার্য বিষয়ের বাইরে গিয়ে এবং বিচারপ্রার্থীদের প্রার্থনা উপেক্ষা করে সাফাই গায়। বলে যে বিপদ সংকেত পেয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা ভীত হয়ে পড়তে পারে— অতএব তা করার দরকার নেই! এই সব কারণে যদি স্থানীয় মানুষরা চুল্লির বিরোধিতা করে, তবে চুল্লি স্থাপন এবং চালানো কঠিন হবে এবং এর ফলে ভারতের শক্তি উৎপাদন বিপন্ন হবে! অতএব বেআইনি কাজকে জাতীয় নীতির স্বার্থে মেনে নিতে হবে— এমনকি তা যদি মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে ঘটে, যদি প্রচুর বিপরীত সাক্ষ্য থাকে, তবুও! নর্মদা বিষয়ক রায়েও আশ্চর্যজনকভাবে আদালত এই একই অবস্থান গ্রহণ করেছিলো।

৩। ফুকুসিমা-র দুর্ঘটনার পর সারা পৃথিবীর সমস্ত নিউক্লিয়ার চুল্লি সুনামি এবং ভূমিকম্প বিষয়ে কতটা সুরক্ষিত, সে বিষয়ে এক বিশেষ সমীক্ষা করা হয়। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতের সরকারি সংস্থা, অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড, যাদের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের ওপর আদালতের অপার আস্থা, সেই খোদ বোর্ড দেখে যে কোদানকুলম কেন্দ্রটির ১৭টি গুরুতর খুঁত রয়েছে— এই খুঁতগুলোর কয়েকটার উল্লেখ আবেদনকারীদের হলফনামাতেও ছিলো। প্রতিটি খুঁতই এমন যে সেগুলির সমাধান না করে সুষ্ঠু এবং সুরক্ষিতভাবে চুল্লি চালানো বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অসম্ভব। নিউক্লিয়ার শক্তি করপোরেশনের হয়ে ভারতের সলিসেটর জেনারেল এই মামলায় আবির্ভূত হয়ে জানান যে ঐ ১৭টি খুঁতের মধ্যে মাত্র ৭টি মেরামত করা গেছে, বাকি দশটি মেরামত করতে অন্তত ৭ বছর সময় লাগবে! আদালত তাতে সন্তুষ্ট হয়ে বলে সব ঠিক আছে— কেন্দ্র চালালে সুরক্ষা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই!

৪। আদালত যে কতটা পক্ষপাতদুষ্ট তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য, সমস্ত সতর্কবাণী উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ভিত্তিহীন প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে আদালত মেনে নিয়েছে যে কোদানকুলম শক্তি-কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় জ্বালানির নির্বিষকরণের কোনও সমস্যাই নেই। কোদানকুলম কর্তৃপক্ষ তেজস্ক্রিয় জ্বালানি-জাত বর্জ্য নির্বিষকরণের দুটি প্রক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রথমটি হলো জ্বালানি-বর্জ্য বিদ্যুৎ-কেন্দ্রেই পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করে পুনরায় ব্যবহার করা। এর জন্য দীর্ঘ সময় এই তীব্র তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন ব্যবহৃত জ্বালানি বিদ্যুৎকেন্দ্রেই সক্রিয় করে রাখতে হবে। তাকে জল দিয়ে ক্রমাগত ঠাণ্ডা করতে হবে এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য আগাম বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা করতে হবে।

কোদানকুলমে এই বিপদ সংকেত ব্যবস্থা বসানোর কাজ শুরু হওয়ার কথা ২০১৪ সালের মাঝামাঝি। মনে রাখতে হবে যে জাপানের ফুকুসিমার দুটি চুল্লির বিস্ফোরণের কারণ সুনামি বা ভূমিকম্প নয়- বরং ঐ ব্যবহৃত-বর্জ্য ভাণ্ডারে নজরদারি ব্যবস্থা ভেঙে পড়া। অতএব এই বিষয়ে নিউক্লিয়ার শক্তি নিগম এবং ভারতের মহামান্য সলিসিটর জেনারেলের যাবতীয় প্রতিশ্রুতির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই। দ্বিতীয় পদ্ধতি নিয়ে যে প্রতিশ্রুতির কথা শুনে আদালত সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছে তা এই

যে, এই ব্যবহৃত বর্জ্য বিদ্যুৎ-কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিয়ে কোলার-এর পরিত্যক্ত স্বর্ণখনির গহ্বরে কবরস্থ করা হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার কথা জানাজানির পর কোলারের পরিত্যক্ত স্বর্ণখনি অঞ্চলের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে এমন তীব্র আন্দোলন করেন যে নিউক্লিয়ার শক্তি নিগম তাদের এই পরিকল্পনা বাতিল বলে ঘোষণা করে এবং আদালতে বর্তমান মামলায় হলফনামা পেশ করার আগেই তা ঘোষিত হয়। কাজেই কোলার স্বর্ণখনিতে বর্জ্য চালানের পরিকল্পনাটি বাস্তবে অস্তিত্বহীন। আদালতও তা জানেন, অথচ সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতেই সন্তুষ্ট হয়ে ভারতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যে কত উচ্চমানের তার বর্ণনায় রায়ের প্রায় ৬ পাতা ব্যয় করা হয়েছে।

৫। পরিবেশের ওপর কোদানকুলম বিদ্যুৎ চুল্লির সম্মিলিত প্রভাবের বিষয়ে কোনও সুসংহত সমীক্ষা হয়নি আজও। আবেদনকারীরা বলেছেন যে এই প্রকল্প ঘিরে অন্যান্য যেসব নির্ভরশীল প্রকল্প চালু হচ্ছে তার সম্মিলিত ফল বিচার করা দরকার। আদালতের বক্তব্য, প্রকল্পটি যখন শুরু হয়েছিলো, তখন (১৯৮৮-এর গোড়ায়) এই সমস্ত প্রকল্পে পরিবেশ-সমীক্ষার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু এই প্রকল্পে পরবর্তীকালে যে সমস্ত চুল্লি সংযুক্ত হয়েছে বর্তমান আইন মতে তাদের জন্য পরিবেশ- সমীক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্তু আদালতের যুক্তি হলো যে আদি প্রকল্প যেহেতু পুরোনো আইনে চলেছে, অতএব নতুন আইনকে পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে লাগু করা যাবে না। ভেবে দেখুন— ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার প্ল্যান্টটি যদি তাদের পুরোনো লাইসেন্স ব্যবহার করে আরও বিপজ্জনক গ্যাস উৎপাদনের যন্ত্র বসায়, তবে সেটিও আইনসঙ্গত হবে- কেননা ১৯৮২ সালে তো পরিবেশ- সমীক্ষার আইন ছিলো না!

৬। এইবার আমরা আসি আদালতের শেষ দ্বিচারিতায়, যা এই রায়ের দ্বিতীয় পর্বে দৃষ্টিকটু ভাবে প্রকট হয়েছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য সংবিধান প্রদত্ত অধিকার এবং সমষ্টির স্বার্থে সেই অধিকারের ''মৃদু লঙঘন'' মেনে নেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে আদালত দীর্ঘ পরিসর ব্যয় করেছে। আদালতের মতে, দেশের শক্তির চাহিদার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রেখে একথা বলতেই হচ্ছে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারের ''মৃদু লঙঘন'' মোটেই দোষের নয়। এই বিষয়ে আমরা আদালতকে সরাসরি উদ্ধৃত করছি :

> Larger public interest of the community should give way to individual apprehension of violation of human rights and right to life guaranteed under article 21.

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

এখানে যা বলার বিষয় তা হলো এই 'individual' হলো একটি বড় অঞ্চলের ৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষ, যারা গত ৬৩০ দিন ধরে আন্দোলন করছেন, যাঁদের সমর্থনে সারা দেশের প্রায় দুকোটি মানুষ সামিল। সামিল সেনাবাহিনীর প্রাক্তন উচ্চ পদাধিকারী থেকে শুরু করে চারজন প্রাক্তন বিচারপতি, শ-পাঁচেক লেখক, এক হাজার শিল্পী, কয়েক হাজার নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান-জানা বিজ্ঞানী এবং ভারতের অ্যাটমিক রেগুলেটরি বোর্ড-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডাঃ গোপালকৃষ্ণণ! যে আন্তর্জাতিক বিধির কথা আদালতের রায়ের ছত্রে ছত্রে, সেই আন্তর্জাতিক বিধি যাঁরা প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গত ২০ বছর ধরে ভিভিইআর প্রজন্মের নিউক্লিয়ার চুল্লির বিপদ নিয়ে সরব। আর কোদানকুলমের চুল্লি হলো এই ভিভিইআর জাতের।

পুনশ্চ: শেষে কয়েকটা তথ্য না দিলেই নয়। কোদানকুলম চুল্লির কয়েকশো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেছে রাশিয়ার একটি সংস্থা, জিয়ো-পোডল্স্ক। এই সংস্থাটি একটি দুনম্বরি সংস্থা। এই সংস্থার সরবরাহ সংক্রান্ত ডিরেক্টর সের্গেই শুটভ রদ্দি মাল দিয়ে যন্ত্রাংশ তৈরি করে হাতে নাতে ধরা পড়ে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাজতে যান। ভারতের মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয় এই তথ্য সম্পর্কে অবহিত। ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তি নিগম স্বীকার করেছে যে তারা জিয়ো-পোডল্স্ক থেকে কোদানকুলমের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ কিনেছে!

২০০৮ সালে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় যে, কোদানকুলমে যদি দুর্ঘটনা ঘটে এবং তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা চুল্লির নক্সার খুঁতের জন্য দুর্ঘটনা ঘটেছে, তবে ভারতের যে নিউক্লিয়ার দায়বদ্ধতা আইন, যার মাধ্যমে সরবরাহকারীকে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে, সেই আইন রাশিয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে না। আর ভিভিইআর চুল্লি যদি চের্নোবিলের মতো ফেটে যায়, যদি রদ্দিমালের জন্য বিপদ ঘটে তবে মরবে তামিলনাড়ুর জেলেরা আর ভূপাল দুর্ঘটনার পর ইউনিয়ন কার্বাইড যেমন চম্পট দিয়েছে, কোদানকুলম নির্মাণের রাশিয়ান সংস্থা, রোশঅ্যাটম একই ভাবে চম্পট দেবে!

ভারতের আদালত অবশ্য মনে করেন না যে এমন দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব। ছোটো কয়েকটা তথ্য দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক।

রাশিয়া নিজেই রোশঅ্যাটম-এর সরবরাহ করা বালাকোভো নিউক্লিয়ার চুল্লির ১ এবং ২ নং ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছে দুর্ঘটনার ভয়ে। বন্ধ করে দিয়েছে নোভো ভোরোনেজ চুল্লিও। লেনিনগ্রাদে এলপিপি-২ নিউক্লিয়ার চুল্লিটি তৈরি হচ্ছিল যার প্রায় সব কিছুই জিয়ো-পোডল্স্ক সরবরাহ করেছে। জুলাই ২১, ২০১১ এই চুল্লিটি ভেঙে পড়ে। দেখা যায়, অতি নিম্ন মানের ইস্পাত ব্যবহার করার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তা সরবরাহ করেছে এই জিয়ো-পোডল্স্ক!

দীপংকর চক্রবর্তী ও মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ

মিলন মালাকার

মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ পত্রিকা প্রথম সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী এবং আমৃত্যু তিনিই ছিলেন স্বত্বাধিকারী। ২০০৩ সালের মে মাসে বহরমপুর শহর ছেড়ে তিনি চিকিৎসা ও *অনীক* পত্রিকার প্রয়োজনে তেঘরিয়া শ্যামবিহার আবাসনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। তবু ২০০৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর নামটাই দেখা গিয়েছে যদিও ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে পাশাপাশি কার্যকরী সম্পাদক হিসাবে নারায়ণ সরকারের নামটাও ছাপা হতে থাকে।

দীপংকরদা *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণকে* কোন সংগঠন হিসাবে গড়তে চাননি বা কোন সংগঠনের পরিচালিত পত্রিকা হিসাবে তুলে ধরতে চাননি। প্রায়ই বলতেন এটি একটি কেবল পত্রিকা, কোন সংগঠন নয়। বহরমপুরে থাকা কালেই শেষ বছর সম্পাদনার কাজ থেকে কার্যত হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। নারায়ণ সরকার তখনো কর্ম উপলক্ষে মালদায় থাকতে বাধ্য হওয়ায় যাকে পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাকে সব সময় যথোচিত পরামর্শ দিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ছিল পাক্ষিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ সালের এক সেপ্টেম্বর মাসে। পত্রিকায় সাধারণত অন্যান্য পত্রিকার মতো সম্পাদকীয় কলম ছিল না, দুই একটি সংখ্যা অবশ্য ব্যতিক্রম। সেই ধারাটি এখনো বজায় রেখেছেন বর্তমান সম্পাদক। সহযোগীরা অনেকেই এই জাতীয় কলম রাখার পক্ষে সওয়াল করতেন এই যুক্তিতে যে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার লেখাগুলি সম্বন্ধে এবং সমকালীন নাড়া দেওয়া ঘটনাবলী সম্পর্কে পত্রিকার নিজস্ব মতটা পাঠকদের জানানো দরকার। দীপংকরদা এই যুক্তি গ্রহণ করতেন না, বলতেন, *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ* কোন সংগঠন নয়, একটি সংবাদ পত্রিকা, তার আবার নিজস্ব মত কী? তবে পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি 'আমাদের কথা' শিরোনামে লিখেছিলেন, "'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' মুর্শিদাবাদ জেলায় সমীক্ষামুলক সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বলা যায়, নবতম প্রচেষ্টা। এই ধরনের প্রচেষ্টা আগেও নেওয়া হয়েছে, কিছু সাফল্যও তাতে অর্জিত হয়েছে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সেগুলির অপমৃত্যু ঘটেছে। সেই সব অতীত অভিজ্ঞতার ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ করে এবং নেতিবাচক দিকগুলি থেকে যথোচিত শিক্ষা গ্রহণ করে 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' পথ খুঁজে নেবার এবং বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা তা অবশ্যই প্রাথমিক ভাবে নির্ভর করবে আমাদের আন্তরিকতা ও যোগ্যতার ওপর এবং পরোক্ষভাবে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতার ওপর।

"মুর্শিদাবাদ জেলা তার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভুমিকা, সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহ এবং জনজীবনের সমস্যাগুলির ঘনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট এই প্রত্রিকায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' এ জেলাকে দেখবে এবং দেখাবে, এবং সেটা করবে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র এ পত্রিকা হবে না, কিন্তু তাই বলে রাজনীতিকে এড়িয়েও চলবে না। দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে এ পত্রিকা সব সময় সোচ্চার থাকবে, এবং তা করতে গিয়ে কোনোরকম সুবিধাবাদ বা আপষের মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেবে না।" ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর ১৫ তারিখের সংখ্যায় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তিনি রাজীব গান্ধী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও রেল মাশুল (বিশেষত ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির ডাক মাশুল) বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও বামপন্থী দলগুলির এই বিষয়ে অদ্ভুত নীরবতাকে ধিক্কার জানিয়ে। আবার ১৯৮৮ সালের আগস্ট ১৫ তারিখের সংখ্যায় 'একটি ঘোষণা' শিরোনামে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছিল, "'মানহানি বিল'-এর মাধ্যমে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ তীব্রতর করে তোলার যে চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার, 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই বিলের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত সাংবাদিক-সংস্থা যে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে, 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' তার সক্রিয় শরিক বলে ঘোষণা করছে।" অর্থাৎ পত্রিকার যে একটি নিজস্ব মত আছে সেটি তিনি কখনো কখনো প্রমাণ ও প্রকাশ করেছেন।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারি পাঁচ তারিখে দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত ও সুকান্ত রাহা কর্তৃক প্রকাশিত *মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা* নামের পাক্ষিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেও 'সম্পাদকীয়র বদলে' শিরোনামে লেখা হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠায়, "দৈনন্দিন ঘটনা বা সংবাদের চেয়ে এতে বেশি জোর দেওয়া হবে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টের ওপর। এবং এতে অনুসৃত হবে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।" লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর শুভেচ্ছাও *মুর্শিদাবাদ সমীক্ষার* প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। দিদি লিখেছিলেন, "জেলায় বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র আছে, তবু এ কাগজের দরকার ছিল।... এর উদ্দেশ্যের স্বতন্ত্রতাতেই এর বৈশিষ্ট্য।"

প্রত্যেক মাসের পাঁচ ও কুড়ি তারিখে *মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা* বের করার ঘোষণা থাকলেও জুন মাস থেকেই প্রকাশনা অনিয়মিত হতে থাকে এবং ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ষোলোটি সংখ্যা বের হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯৮৪-র সেপ্টেম্বর থেকে

মুর্শিদাবাদ বীক্ষণের আত্মপ্রকাশ। উদ্দেশ্য ও সম্পাদক এবং প্রকাশস্থান অপরিবর্তিত থাকায় অনেকেই ভেবে থাকেন এটি *মুর্শিদাবাদ সমীক্ষারই* রূপান্তর। কিন্তু দীপংকরদা একে 'নবতম প্রচেষ্টা' বলেই আখ্যায়িত করেছেন।

মুর্শিদাবাদের সমস্যা, জনজীবনের ক্ষোভ, সংস্কৃতি চর্চার উপর বহু সংবাদ, বিশ্লেষণমুলক ও ভিন্নমতের বহু লেখা ছাপা হয়েছে *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ*-এ। লিখেছেন দীপংকরদা স্বয়ং, সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত, শক্তিনাথ ঝা, আবুল হাসনাত, বিজয় কুমার গুপ্ত, বিষাণ কুমার গুপ্ত, অতীন্দ্র মজুমদার, খাজিম আহমেদ, কমল সমাজদ্দার, চিত্ত দাস প্রমুখ অনেকে এবং মহাশ্বেতা দেবী। তাছাড়া প্রাসঙ্গিক লেখা অন্য পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রণও করা হয়েছে, অবশ্যই প্রাপ্তিস্বীকার করেই। শাসক সিপিআইএম ও কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব কোন দিনই *বীক্ষণকে* ভাল ভাবে নেয়নি যদিও ঐ দলের অনেক ছোটো ও মাঝারি স্তরের নেতারাই দীপংকরদাকে অনেক খবর দিয়ে যেতেন ছাপানোর জন্য। পঞ্চায়েত নির্বাচন, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণী লেখা তিনি ছেপেছেন এই পত্রিকায়। ১৯৯৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের কুড়ি বছর পূর্তিতে দীপুদা লিখলেন *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণে*, ''বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল 'সীমিত' সাধ্যের মধ্যে জনগণকে কিছু 'রিলিফ' দেবার জন্য, এবং বিশেষত এ রাজ্যের জনগণকে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য সচেতন ও অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্য। অন্তত এটাই ছিল তাদের ঘোষণা। প্রথম উদ্দেশ্যটি যে কোনো বুর্জোয়া পার্টির ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থেই সাধ্যমতো সাধনের চেষ্টা করে, এতে নতুনত্বের কিছু নেই। বরং বলা যায়, এই 'রিলিফ' দেবার ব্যাপারে দীর্ঘদিনের নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে যেটুকু আন্তরিকতা, দক্ষতা ও সততা প্রত্যাশা করা গেছিল, সেই প্রত্যাশা পরিপূরিত হয়নি।... কিন্তু বামপন্থী হিসেবে এই সরকারের মূল্যায়নের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে তাদের ঘোষিত তৃতীয় উদ্দেশ্যটি— ...গত বিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার 'গণআন্দোলনের ঢাল' হিসেবে ব্যবহারের মৌখিক ঘোষণা পর্যন্ত আজ নেই, বরং নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের যে কোনো ন্যায্য আন্দোলনকেই পুলিশ তথা রাষ্ট্রশক্তি থেকে শুরু করে দলীয় ক্যাডার ব্যবহার করে পিটিয়ে, বা সংগ্রাম বিরোধী পাল্টা দালাল সংগঠন খাড়া করে গলা টিপে মারার অজস্র ঘটনা আমাদের সামনে রয়েছে।'' মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার স্কুল ভিত্তিক ফলাফলও ছাপা হয়েছে। আশির দশকের শেষের দিক থেকেই জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গণ টোকাটুকির প্রচলন, সেই টোকাটুকি বন্ধ করতে গিয়ে শিক্ষকদের নিগৃহীত হওয়ার খবর দীপংকরদা ছেপেছেন তাঁর পাক্ষিকে। প্রকাশিত কোন বিষয়ের উপর ভিন্ন মতের কোন চিঠি এলে মূল লেখকের মন্তব্য সহ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি প্রশাসনের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর সতত নজর রাখা। সেই দায়িত্ব প্রতিপালিত হলেও তার প্রশংসায় পত্রিকায় সাধারণত কোন লেখা ছাপা হয়নি, বরং দায়িত্বে অবহেলা, দ্বিচারিতা পরিলক্ষিত হলে তার বিরোধিতায় সোচ্চার থেকেছে *বীক্ষণ*। তবে অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে যে আমলারা নিয়মমাফিক কাজ করে গিয়েছেন তাঁদের প্রশংসায় মুখর থেকেছেন।

রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি হত্যা অবশ্যই ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর অপরাধ। রাষ্ট্র রাজদ্রোহিতাকে মনে করে রাষ্ট্রকে খুন করার উদ্যোগ, তাই তার কাছে রাজদ্রোহিতা হল সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অপরাধ এবং সে তাই সমস্ত রকম শক্তি নিয়ে এই রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে দমন করতে উঠে পড়ে লাগে। ব্রিটিশ আমলে যেমনভাবে দেখা হতো স্বাধীনতার যোদ্ধাদের, ব্রিটিশ পরবর্তী আমলেও কোনো সরকারেরই সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগঠন ইন্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল সরকারের দেশপ্রেমিকদের উপর নামিয়ে আনা ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরোধিতা করতে এবং ন্যায়বিচার চাইতে। ভারতীয় শাসকরাও যখন একই মানসিকতা নিয়ে তার বিরোধী শক্তির উপর আক্রমণ নামিয়ে আনতে থাকলো তখন এই রাজ্যের মানবিক মূল্যবোধের মানুষরা নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। ১৯৭২ সালের ২৫ জুন কলকাতায় কপিল ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তকে সম্পাদক করে গড়ে উঠল স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম মানবাধিকার সংগঠন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, যা এখনো সক্রিয় এবং এপিডিআর এই নামে বহুল পরিচিত। দীপংকর চক্রবর্তী ঐ সমিতির প্রথম সংগঠনী সভায় উপস্থিত ছিলেন। বহরমপুরে ফিরে এসে ঐ একই নামে মুর্শিদাবাদ কমিটি তৈরি করলেন ঐ ১৯৭২ সালেই, আন্দামান ফেরত স্বাধীনতা সংগ্রামী অনন্ত ভট্টাচার্যকে আহ্বায়ক করে। ১৯৭৪ সালে এই কমিটির প্রথম সম্মেলন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে। অনন্ত ভট্টাচার্য ফের আহ্বায়ক মনোনীত হন। ১৯৭৫ সালে তাঁর মৃত্যু হলে আর এক বামপন্থী আরএসপি-র নীরদবরণ সরকার (কালোশশী) আহ্বায়ক মনোনীত হন। কিন্তু দীপংকরদাই ছিলেন এই শাখার মুখ্য ব্যক্তি। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে এপিডিআর কার্যত নিষিদ্ধ হয় এবং তার মূল সংগঠকেরা গ্রেপ্তার হন। মুর্শিদাবাদ জেলার সংগঠনের দুই প্রধান সংগঠক দীপংকরদা এবং সুকান্ত রাহা গ্রেপ্তার হন। ১৯৭৭ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বন্দীমুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ভিন্ন নামের সংগঠনের ব্যানারে। ১৯৭৮ সালে ফের সমিতি পুনর্জ্জীবিত হয়। মুর্শিদাবাদ কমিটির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে দীপংকরদার উদ্যোগেই। মাঝে কিছু ভাটা। ১৯৯০ সাল থেকে এক জন নতুন মুখকে সম্পাদক করে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় সমিতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা নেওয়া হয় এবং বন্দীমুক্তি, জেলায় প্রতিটি পুলিশি

অত্যাচারের তদন্ত ও তার প্রতিবাদে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান, কাস্টডি মেমো, এ্যারেস্ট মেমোর দাবিতে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলা, রাষ্ট্রের নতুন দমন-পীড়ন আইনের প্রতিবাদে জনমত গড়ে তোলার মতো বিবিধ কাজ সম্পন্ন করতে থাকে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির নেতৃত্বে জেলার মানবাধিকার কর্মীরা। দীপংকরদা ২০০০ সাল পর্যন্ত এই কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং তারপর ছিলেন উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি। ফলত মানবাধিকার লঙঘন ও এপিডিআর-এর কাজ নিয়ে প্রায় সমস্ত খবর *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ* পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয়েছে, সমিতির কোনো কোনো সদস্য *বীক্ষণকে* তাদের মুখপত্র হিসাবেও দেখতেন। দীপংকরদা অবশ্য একথা শুনে হো হো করে হাসতেন। ১৯৮৮ সালে কাটরা গণহত্যা, ১৯৯২ সালে হরিহরপাড়া গণহত্যা তদন্ত প্রতিবেদন ঘটনার পরে পরেই *বীক্ষণে* ছাপা হয়েছে।১৯৯১ সালে বহরমপুরে এপিডিআর-এর রাজ্য সম্মেলন হলে সেই উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র ছাপা হয়েছিল *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণে*, যেখানে রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত ত্রিশ দফা মানবাধিকার সনদ, এপিডিআর-এর ইতিহাস ও জেলায় ঐ সংগঠনের কাজ সম্বন্ধে বেশ বড় করে লেখা হয়েছিল।

বর্তিকা পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তি ও ঐ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু সম্পাদক মণীশ ঘটকের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ১৯৮১ সালে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলাস্তরে বইমেলা শুরু হয় যার আয়োজক কমিটির প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে মণীশ-কন্যা মহাশ্বেতাদি ও দীপংকরদা। ১৯৮৩ সালের দ্বিতীয় বইমেলা কমিটিরও সভাপতি ও সম্পাদক পদে দুজনেই ছিলেন। দ্বিতীয় মেলা স্থানীয় বই পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। বইমেলার সাফল্য ও জনজীবনে তার প্রভাব লক্ষ্য করে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্ব নড়েচড়ে বসে। দীপংকরদা আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আর এই মেলা আয়োজনের দায়িত্বে থাকবেন না। শাসক দল বইমেলা কমিটির সাধারণ সভায় পরিকল্পিতভাবে বহু কর্মী-সমর্থকদের হাজির করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কমিটির মূল নেতৃত্বে আসে। শুরু হল মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলার উপর শাসক দলের দখলদারি ও ক্ষমতা প্রদর্শন। দীপংকরদা পরবর্তীতে প্রায় প্রত্যেক বার বইমেলার সময় *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণের* পাতায় তাঁর ক্ষোভ, ক্রোধ ব্যক্ত করেছেন এই দখলদারির বিরুদ্ধে।

১৯৮৩ সালের শেষ দিকে দীপংকরদা উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন ফেডারেশন গড়ে তোলার। তাঁকে সম্পাদক করে একটা প্রস্তুতি কমিটিও গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু লিট্‌ল ম্যাগাজিন ফেডারেশন এই জেলার বুকে পা ফেলতে পারেনি। এবার তিনি মেতে উঠলেন মুমূর্ষু মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘকে বাঁচাতে। প্রায় তিন যুগের পুরনো এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন তিনি টানা ১৯৮২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু কিছু কুচক্রীর জন্য এ সংস্থাটি উঠে যেতে বসেছিল। ১৯৮৬ সালে দীপংকরদার নেতৃত্বে নয়া এ্যাড-হক কমিটি গড়ে এটিকে ফের চাঙ্গা করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করে জেলার ক্ষুদ্র পত্রিকার অপেশাদার সাংবাদিকদের মানোন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা নেওয়া হয় এবং শশাঙ্কশেখর সান্যাল কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মফঃস্বলের ক্ষুদ্র পত্রিকার জন্য সরকারি সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করা হয়।

সপ্তাহে একটা দিন নির্দিষ্ট ছিল যেদিন ইন্দ্রপ্রস্থে দীপংকরদার বাড়ির ছোট একটা ঘরে *বীক্ষণের* কর্মী-সাংবাদিকরা সান্ধ্য আড্ডায় মিলিত হতেন অনুসারে। একটা ছোট্ট ইমার্সন হীটার ছিল যার সাহায্যে জল গরম করে তিনি দুধ ছাড়া কালো কফি তৈরি করতেন, নিজে খেতেন এবং ইচ্ছুক অন্যদেরও খাওয়াতেন। এই বৈঠকে পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখালিখির দায়িত্ব অর্পণ হতো, গ্রাহক-চাঁদা আদায় সম্পর্কিত আলোচনা হতো। শুধু সাংবাদিক নয়, পত্রিকা প্রকাশনা ও বিলিতে এবং গ্রাহক-চাঁদা আদায়ে যারা নিয়মিত সচেষ্ট ছিলেন তাঁরাও ছিলেন *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ* পত্রিকার কর্মী। ২০০২ সাল থেকেই নিজের হাতে রাখা কাজগুলো একে একে হস্তান্তর করতে থাকেন। বহরমপুর শহরে থেকেও শেষ দিকে কয়েকটি সংখ্যার পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে, যদিও পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে তাঁর নামই ছাপা হয়েছে। দীপংকরদা শেখালেন কিভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে হয়, বিজ্ঞাপন ছাপানোর পর কিভাবে টাকা আদায় করতে হয়। ২০০৩ সালের ১৯ জানুয়ারি পত্রিকার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের একটা সভা আহ্বান করে প্রকাশ্যে জানান দিলেন যে তিনি বহরমপুর শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং সম্পাদক মনোনীত করলেন নারায়ণ সরকারকে ও সেই ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে করলেন কর্মাধ্যক্ষ।

দীপংকরদা বহরমপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ* তার স্থায়ী দপ্তরের ঠিকানা হারিয়ে ফেলে এবং এখনো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে পত্রিকার কর্মীদের মধ্যে নিয়মিত মুখোমুখী আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না যদিও নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ হয়নি। তিনি এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর *বীক্ষণের* কর্মীদের কোন কোন শুভানুধ্যায়ী বলেছেন, "উনি চলে গেলেও *বীক্ষণের* জন্য তাঁর বাড়িতে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে যেতে পারতেন।" দীপংকরদা বহরমপুর ছেড়ে চলে গেলেও *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ* প্রায়ই তাঁর পরামর্শ পেতো, সহযোগিতা নিত। তিনি নিজে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লিখে পাঠাতেন ছাপানোর জন্য, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু গ্রাহক আছেন যাঁদের গ্রাহক-চাঁদা প্রথমে তাঁর কাছে জমা পড়ত, পরে *বীক্ষণের* তহবিলে। অর্থাৎ বাড়িটা হারালেও দীপংকরদা ছিলেন *মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ*-র আশ্রয়। ২৭ জানুয়ারি রাত দশটায় তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে কি পত্রিকা যথার্থই নিরাশ্রয় হলো? ভবিষ্যৎ তার উত্তর দেবে।

Unfiled Notes Page 40